জুলাই–আগস্ট ২০০৯ ❑ দশম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ ৬ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

"ভয় পাই শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়"
হিংসা–অহিংসা নিয়ে কিছু কথাবার্তা পৃষ্ঠা ৩

শিকার পৃষ্ঠা ১০

হিংসা বিষয়ে ঘিনুয়া–সাঁওতাল উপস্থাপনা পৃষ্ঠা ১১

হিংসা প্রসঙ্গে এক অহিংসাপন্থীর ভাবনা পৃষ্ঠা ১২

জিনগত মারণযজ্ঞ পারমাণবিক মারণযজ্ঞের চেয়েও ধ্বংসাত্মক পৃষ্ঠা ১৭

এক মালয়ালি মুম্বইবাসীর বঙ্গদর্শন পৃষ্ঠা ২০

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে চলেছে পৃষ্ঠা ২২

চিঠিপত্র :
১. বিষয় : সমস্যা সমাধানে 'মন্থন' পৃষ্ঠা ২

হিংসা–অহিংসার তর্ক

হিংসা–অহিংসার প্রসঙ্গ নিছক একটা তর্কই নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে, তার অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে একই সঙ্গে হিংসা এবং অহিংসা। যে ব্যক্তি জীব–জন্তু ভালোবাসে, প্রকৃতি বা অরণ্য প্রেমিক, সে-ই হয়তো জীবনের অন্য ক্ষেত্রে কিছুটা হিংস্র। আমরা নিজের বাইরে অন্য ব্যক্তির মধ্যে, সমাজের মধ্যে, সংগঠন–দল–প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিংসা খুঁজি, দেখতে পাই, আক্রান্ত হই, দুঃখ পাই। তাই বলে আলাদা করে এ নিয়ে ভাবতেও অভ্যস্ত নই। কিন্তু আজ এ নিয়ে আলাদা করে কিছুটা ভাবার প্রয়োজন এসেছে। কেন? কারণ আমরা বেশ টের পাই নানান দিক থেকে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহ বিপন্ন। এই বিপন্নতার মধ্যেই রয়েছে হিংসার বাড়াবাড়ি। প্রত্যেকের কাছেই এর ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই বাড়াবাড়ি যদি আমাদের অপছন্দ হয়, তাহলে এসে পড়ে সচেতনভাবে কিছু করার প্রসঙ্গ। কী করব? কীভাবে চলব? এসব ঠিক করার জন্য কিছুটা কথাবার্তাও দরকার অন্যদের সঙ্গে। এদিক থেকেই এবার আমরা এই সংখ্যার পরিকল্পনা করেছি। এবারের মন্থন হয়ে উঠুক হিংসা–অহিংসা নিয়ে সমাজ জোড়া মন্থনের অঙ্গ। অবশ্যই এই মন্থনের অঙ্গ হিসেবে সমাজ জুড়ে ইতিমধ্যেই উপস্থিত আজকের নানান আন্দোলন, তার নতুন বিষয়বস্তু এবং নতুন নতুন আঙ্গিক বা রূপ। আসুন আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে এই মন্থনে অংশ নিই।

১. বিষয় : সমস্যা সমাধানে 'মন্থন'

সম্পাদক
মন্থন সাময়িকী

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর চিন্তার জগতে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিফলন মার্চ-এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যায় পত্রলেখকের চিঠিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এটা একটা বাস্তব ঘটনা, একে অস্বীকার করার উপায় নেই। হতাশা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে গভীরে চিন্তা করার ইচ্ছাটা পর্যন্ত চলে গেছে। কারণ অনুসন্ধানের স্বাভাবিক স্পৃহা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। পত্রলেখক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাকে মাথা মোটার কাজ বলে ফেলেছেন। অথচ এই কাজ করতে করতেই মানবজাতির মস্তিষ্কের বিকাশ হয়ে চলেছে। 'শুধু কাজ করে যাও, ফলের আশা কোরো না', 'আন্দোলনই সব কিছু, লক্ষ্য বলে কিছু নেই' — পত্রলেখকের ভাবনাতে এমনটাও আছে বলে মনে হচ্ছে। লেখক বলেছেন, 'বিকল্প সমাজ গঠন বা স্থাপন মার্ক্সবাদীদের ঘোষিত প্রকল্প।' তিনি বিনোবা ভাবেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'কমিউনিস্টরা মনে করে রাষ্ট্র ঘিয়ের মতো এক জমাট অবস্থা, কমিউনিস্টরা তা দখল করলে তা আপনি গলে যাবে, রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ হবে।' কিন্তু মার্ক্স বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র শুকিয়ে মরবে। আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সমেত যে রাষ্ট্র তা শুকিয়ে মরবে না। তাকে বরং ভাঙতে হবে এবং নতুন রাষ্ট্র গড়তে হবে যা শুকিয়ে মরবে। প্যারি কমিউন ছিল সেই ধরনের রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই ধরনের রাষ্ট্র ছিল না, ফলে তা শুকিয়ে মরেনি। এটা ছিল একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। শুকিয়ে মরার অর্থ, সমস্ত নাগরিক রাষ্ট্র প্রশাসনে অংশগ্রহণ করবে। ফলত, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে — এটাই ছিল মার্ক্সের ধারণা। এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে বিশ্ববিপ্লব। বিশ্ববিপ্লবের শুরুটা হবে ইউরোপ থেকে। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানবজাতি শ্রেণীহীন সমাজে পৌঁছে যাবে, পুঁজি-সম্পর্কের অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ফলত মন্থন পত্রিকার জন্ম হতে পেরেছে। একটা সময় পর্যন্ত মার্ক্স যত শক্তিশালী ছিলেন, আজ তত দুর্বল। সামাজিক-অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি যতদিন মার্ক্সের ধারণা মতো চলছিল, ততদিন মার্ক্স পুঁজিপতিদের কাছে আতঙ্ক ছিলেন। বর্তমানে মার্ক্স তত ভয়ঙ্কর নন। কিন্তু মার্ক্স পুঁজির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। পণ্যই যে পুঁজির উৎস, পুঁজির ভিত্তি — সেটা তিনি দেখিয়েছিলেন। ফলে মার্ক্সের ভুত মাঝেমাঝেই তাড়া করে। ফরাসি বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। পরবর্তী বিপ্লব হবার কথা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু বাস্তবে হল পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব; লেনিনবাদের পরিভাষায় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। পুঁজিবাদ তার অন্তিম পর্বে পৌঁছে গেছে — এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল। বাস্তব দেখিয়ে দিল ধারণাটা ভুল। কিন্তু দেখা গেল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের (কর্পোরেট) উদ্ভব ঘটল। কর্পোরেট পুঁজির সমালোচনা মন্থন পত্রিকা করে, কিন্তু সাধারণভাবে পুঁজিবাদের সমালোচনা করে না, পণ্য অর্থনীতির সমালোচনা করে না। পণ্যের সমালোচনা না করে পুঁজির সমালোচনা হেঁয়ালি ছাড়া কিছু নয়।

সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলি দূর করতে চান, না রেখে দিতে চান? যদি মনে করেন সমস্যাগুলি থাকুক আর 'মন্থন সাময়িকী'-ও থাকুক, তাহলে বলার কিছু নেই। আর যদি সমস্যা দূর করতে চান, তাহলে দূর করার উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। এখনই খুঁজে পেলাম কি পেলাম না, সেটা স্বতন্ত্র বিষয়।

একজনের জ্বর হয়েছে, জ্বরে মানুষটা কত কষ্ট পাচ্ছে, তার বর্ণনা মন্থন করবে, কষ্টের বিবরণ দেবে। কিন্তু জ্বরের কারণ খুঁজতে মাথা ঘামাবে না। যতদিন জ্বরের ভোগান্তি থাকবে, ততদিন মন্থনে বিবরণ থাকবে।

নিরীহ পণ্য থেকেই ভয়ঙ্কর কর্পোরেট পুঁজির জন্ম। পণ্যকে বাতিল না করে পুঁজিকে বাতিল করা যাবে না। পণ্য অর্থনীতির কারণেই মানব সমাজে ধ্বংসের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পত্রলেখক যদি অন্য কিছু মনে করেন, তাহলে তা স্পষ্ট করে বলুন। নতুবা মনে করব সময় কাটানোর জন্য মন্থনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। 'মন্থন সাময়িকী' পত্রিকা কীভাবে চলবে, তা নির্ভর করছে মালিকানা স্বত্বের ওপর। কারখানা কীভাবে চলবে তা নির্ভর করে কারখানার মালিকের ওপর। পাঠক হিসেবে অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করে যাব, কিন্তু ...। হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা কেমন হবে, কীভাবে হবে, তা নির্ভর করে হাসপাতালের মালিকের ওপর, কর্মীদের ওপর।

পত্রলেখক আর একটি অভিযোগ করেছেন যে মার্ক্সবাদীরা শুধুমাত্র শ্রেণীসত্ত্বার ওপর জোর দেয়। মার্ক্স অন্য সত্ত্বাগুলি দেখেছিলেন। কিন্তু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্য সত্ত্বার ভূমিকা গৌণ। শ্রেণীসত্ত্বার বিলোপ ঘটাতে হবে বলেই এবং এই সত্ত্বার বিলোপ ঘটলেই পুঁজিবাদের বিলোপ ঘটবে বলেই শ্রেণীসংগ্রামের ওপর জোর পড়েছে। অন্য সত্ত্বার ভিত্তিতে আন্দোলন পুঁজিবাদকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না।

পত্রলেখক বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় স্তরে পুঁজির এই দানবীয় কাঠামোটাকে মোকাবিলা তো করতেই হবে'। বোঝাই যাচ্ছে ওঁর ধারণা সেই অতীতেই পড়ে আছে। পুঁজি রাষ্ট্রীয় স্তর অতিক্রম করে গেছে, আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। ফলত আন্তর্জাতিকভাবেই তার মোকাবিলা করতে হবে। আর এখানেই মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সংকট। রাষ্ট্রীয় স্তরে মোকাবিলার তত্ত্ব মার্ক্সবাদে আছে। ফলত সেটা সেকেলে হয়ে গেছে। পুঁজির আন্তর্জাতিক কাঠামোগুলি যদি দেখেও না দেখার ভান করেন, তাহলে বলার কিছু নেই। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রামের অনুপস্থিতিতে পুঁজিকে বিশাল শক্তিশালী মনে হবে। সেটাই তো স্বাভাবিক। আর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন অর্থাৎ মজুরিদাসদের আন্দোলন ব্যতিরেকে পুঁজিবাদকে ছাপিয়ে যাওয়া যাবে না। খুচরো ব্যবসায়ী, কৃষকের অবস্থান থেকে পুঁজিবাদকে ছাপিয়ে যাওয়া যাবে না (তত্ত্বে এবং বাস্তবেও)। ফলত আজকের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে পুঁজিবাদী পার্টিগুলির নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে। আর তথাকথিত বিপ্লবী কমিউনিস্টরা কৃষকের, খুচরো ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হয়ে গেছে। বড়ো জোর তারা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের হয়ে সওয়াল করতে পারে, অর্থাৎ অতীতে নিয়ে যাওয়ার ওকালতি।

'ছোটো কাজ মানে তো সমাজবিচ্ছিন্ন কিছু নয়' — পত্রলেখকের কাছে এই সমাজ এবং পরিসর কতদূর? 'মন্থন' পত্রিকার পিছনে আন্তর্জাতিক শ্রম যুক্ত আছে, সেটা খেয়াল আছে তো? বিশ্ব সামাজিক শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র সমাজের কথা বলছেন না তো? বিশ্বসমাজের গভীরে প্রবেশ করলে তবেই স্বাবলম্বন অর্জন করা যাবে।

মৌলবাদের খপ্পরে পড়লেই মানুষ আবিষ্কারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রেরণা জোগায়, দিশা দেখায়। কেননা এখানে কোন কিছুই চূড়ান্ত নয়। "বিশ্বকে তৈরি জিনিসের যৌগিক সমাহার না ভেবে প্রক্রিয়ার যৌগিক সমাহার বলে বিবেচনা করতে হবে, যেখানে আপাত স্থির জিনিসগুলি তথা আমাদের মাথায় সেইগুলির মানস প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ধারণাগুলি এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে, যেখানে আপাত আপাতন ও সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত এক ক্রমাগ্রসর বিকাশই জয়ী হয় — এই মূল মহান চিন্তা বিশেষত হেগেলের সময় থেকে সাধারণের চেতনায় এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে, তার সাধারণ রূপটি আজ আর বড়ো একটা অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু মুখে এই মূল চিন্তা স্বীকার করা এবং বাস্তবে অনুসন্ধানের প্রতি ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে তার প্রয়োগ করা, এ দুটি আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সর্বদা অন্বেষণ অগ্রসর হয়, তাহলে চরম সমাধান এবং সনাতন সত্যের দাবি চিরকালের মতো শেষ হয়; সমস্ত অর্জিত জয়ের অনিবার্য সীমাটা সম্বন্ধে সবসময়েই হুঁশ থাকে। এই হুঁশ থাকে, যে পরিস্থিতিতে জ্ঞানটি অর্জিত হয়েছে, তার দ্বারাই সে জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত।" (ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান — এঙ্গেলস; নিম্নরেখ আমার।)

১২ জুলাই ২০০৯

শঙ্কর সরকার
পানাগড়, বর্ধমান

সম্পাদকের মন্তব্য :

জুলাই-আগস্ট ২০০৮ সংখ্যায় পাঠক মতিলাল দেবনাথের চিঠি, তার সূত্র ধরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৮ সংখ্যায় আপনার চিঠি, উভয় চিঠির সূত্রে মার্চ-এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যায় রঘু জানার চিঠি এবং সেই সূত্র ধরে এবার আপনার চিঠি — একটা চলমান সংলাপ — ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-পরিসরে থাকা মন্থন-পাঠকদের এক কথোপকথোন। আমার মনে হয় আমাদের সকলের কাছেই এই কথাবার্তা বেশ জরুরি। আপনাকে কেবল অনুরোধ করব, একটু দেখুন তো, কোথায় যেন মাঝপথে আপনার কথাগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। আপনি একটা ভাবনা থেকেই লিখেছেন, কিন্তু আগের পত্রলেখকের সমালোচনার সঙ্গে তা যুক্ত হল কি?

“ভয় পাই শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়”
হিংসা–অহিংসা নিয়ে কিছু কথাবার্তা

২ আগস্ট ২০০৯ মন্থন সাময়িকীর পাঠকদের এক ঘরোয়া আড্ডায় হিংসা-অহিংসা প্রসঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়। সম্পাদকের পক্ষ থেকে আলোচনার সূত্রপাত করার পর শ্রী সৌরীন ভট্টাচার্য বিশদে এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনা পেশ করেন। সেই সূত্র ধরে সকলের মধ্যে কিছুটা সংলাপ চলে। রেকর্ডেড কথাবার্তা সামান্য সম্পাদনা করে এখানে প্রকাশ করা হল। আশা করি এমন এক সময়োপযোগী এবং বিতর্কিত বিষয়ে অন্য পাঠকেরাও অংশ নেবেন এবং চিঠির আকারে লিখে পাঠাবেন।

জিতেন নন্দী : লালগড়ের ঘটনাবলীতে আমরা লালগড় এবং ঝাড়গ্রামের মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য ও প্রতিক্রিয়া দুই-ই জানার চেষ্টা করেছি। আদিবাসী ও অ-আদিবাসী উভয় সমাজের মনোভাব আমরা বোঝার চেষ্টা চালিয়েছি। মন্থন পত্রিকায় সামান্য কিছু এই মর্মে প্রকাশও হয়েছে। তবে জানার ব্যাপারটাও বেশ মুশকিলের। এই প্রসঙ্গেই এসেছিল হিংসার প্রশ্নটা। আমরা দেখতে পেলাম, হিংসার বিষয়টা কেবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং তার পালটা জবাবের মধ্যেই সীমিত নয়। হাজার হাজার গ্রামবাসী যে এই বর্ষার মুখে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরছাড়া হল, তাদের বিষয়টা মিডিয়ার রিপোর্টে গৌণ হয়ে গেল। এর মধ্যে কি হিংসা নেই? তারও কয়েকগুণ পরিবার ঘরছাড়া হয়েছে সুন্দরবনের ঝড়ে। অথচ বিষয়টা রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া কারও কাছেই তেমন আমল পায়নি। কী প্রচণ্ড হিংসা! বিপর্যস্ত সুন্দরবনে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে দেখেছি, সেখানকার সমাজের মধ্যে — আদিবাসী-বাঙালি, পাড়ায়-পাড়ায় — কীরকম রেষারেষি, স্বার্থপরতা রয়েছে। যার ঘরে মশারি রয়েছে, সেও ত্রাণের মশারি ছাড়বে না। সুযোগসন্ধানীরা ত্রাণের ত্রিপল বাগিয়ে নিচ্ছে। আর দুর্নীতি তো আছেই। এসবের মধ্যেও কি হিংসা নেই? রাষ্ট্রীয় হিংসা তো ক্রমাগত ভয়াবহভাবে আধুনিক হয়ে উঠছে। আমেরিকা পাকিস্তানে বিনা চালকে মিশাইল ফেলছে বিমান (ড্রোন অ্যাটাক) থেকে। মিডিয়া তালিবানদের খবর দিচ্ছে, কত সাধারণ বাচ্চা-বুড়ো-মহিলারা ঘায়েল হচ্ছে তার হিসেব নেই। শ্রীলঙ্কায় কী কাণ্ড হয়ে গেল! মাওবাদীদের খবর তো চোখের সামনেই রয়েছে। এতসব বেদনাদায়ক ঘটনা যখন মিডিয়া দারুণ মিউজিক সহকারে রঙিন করে পেশ করে, তার মধ্যে কি হিংসা নেই? এই সূত্রেই এসে পড়ে কর্পোরেট পুঁজির কথা। সৌরীনদা এক জায়গায় লিখেছিলেন, বিশ্বায়নের যুগে পুঁজি আগ্রাসী এবং ছলনাময় — সবটাকে মাথায় রেখে আমরা কীভাবে এই আলোচনায় ঢুকতে পারি?

সৌরীন ভট্টাচার্য : হিংসা বা ভায়োলেন্স এটাকেই একটা বর্গ হিসেবে আলোচনায় আনা উচিত। কারা করল সেটা বড়ো কথা নয়। পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে বড়ো কথাটা হল, রাষ্ট্রের গুলিতে প্রাণ গেল, না মাওবাদী গুলিতে প্রাণ গেল, এটা সত্যিই তো শেষ বিচারে অত জরুরি ব্যাপার নয়। প্রাণটা যদি জরুরি মনে হয়, তাহলে গেল সেটাই বড়ো কথা। কী করে বাঁচানো যায় সেটাই প্রশ্ন। কাজেই হিংসাকে একটা বর্গ হিসাবে আলোচনা করা আমি মনে করি একটা যুক্তিসঙ্গত কাজ। তার অজস্র মাত্রা, মন্থনের গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তেও অনেকগুলো মাত্রা এসেছে, আরও হয়তো যোগ করা যায়। প্রথমেই যে খারাপ কথাটা আমাদের মাথায় আনা উচিত, সেটা বলছিলাম রবীন্দ্রনাথকে দোহাই পেড়ে, রঘুপতির মুখে যে জবাবটা উনি দিয়ে রেখেছেন। যখন রাজপরিবারের রক্ত দরকার হয়েছিল, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি হচ্ছে, তখন জয়সিংহ কেঁপে ওঠে। রাজরক্ত ... হিংসা এই ব্যাপারটা ওঁর যে তেমন পছন্দ নয়, এরকম একটা কথা বলা মাত্রই রঘুপতি দেড়পৃষ্ঠা একটা নিখুঁত ছন্দোবদ্ধ ভাষণে ওঁকে বকে দিয়েছিলেন। ওঁর বকুনিতে প্রধান কথা ছিল, জয়সিংহ তুমি হিংসার কথা বলছ? হিংসা কোথায় নেই? আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব হিংসার সঙ্গে সম্পর্কিত। পোকামাকড়, মাইক্রোব ইত্যাদি সব আমার হিংসার বলি। ফলে মানুষের এই অবস্থানটা আমাদের মাথায় নিয়ে এগোনো দরকার। এটা আমি একটু বেশি জোর দিয়ে বলব এই কারণে, এর উল্টোটা আমাদের দীর্ঘদিনের সংস্কারে আছে — আমরা মানুষ প্রজাতি আসলে বেশ ভালো এবং আমরা আরও ভালো হতে চাই, নাহলে এমন বর্ষার দিনেও আমরা এই আলোচনা করছি কেন? এইখানেই গোড়ায় আমার মনে হয়, যাকে বলে, একটু জল ঢেলে এগোনো উচিত, আমরা ভালো হতে চাইলেও আমাদের কপালে ভালো হওয়া আছে কিনা, আমাদের ভালো হওয়া খুব শক্ত। কারণ — রঘুপতির একটা লাইন ছিল — “... আমি পদে পদে লক্ষকোটি জীবাণু ধ্বংস করি”। আমি অহিংসার কথা বলব, কিন্তু উপায় নেই। আমি সত্যিই জানি না, রঘুপতির ওই বাচনের জবাব কী আছে? জয়সিংহের প্রতি সমস্ত সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয় ... জয়সিংহ তার যে সমাধান করল, অনেক অঙ্ক কষে বার করল ... আমার শিরায় উপশিরায় যে রাজরক্ত আছে ... সেইটা বার করে দেবে। ফলে আপাতত জয়সিংহ তার মান বাঁচাল। আমরাও ব্যক্তিগত স্তরে কেউ কেউ ওইরকম কায়দাকানুন করে আমাদের মানটা বাঁচাই। কিন্তু প্রজাতিগতভাবে মানুষ হিংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে আদৌ পারবে কিনা, এই প্রশ্ন মাথায় রেখে এগোনো দরকার। এভাবে এগোনোর একটা তাৎপর্য আছে বলে আমি মনে করি। এরকম তো একটা মনোভাব হতেই পারে, একদিন রাত্রে আমার মনে হল, হিংসা থেকে সরে আসার আমার তো কোন উপায়ই নেই, তাহলে কাল সকাল থেকে যা যা হিংসার কাজ করার আমি করে যাব। এরও মহান সাহিত্যে উদাহরণ আছে। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এ গোবিন্দলাল ব্যক্তিগত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সারারাত ধরে ভেবেছিল, সু আর কু’র দ্বন্দ্ব হিসেবে যেটা বঙ্কিমচন্দ্র সাজিয়েছিলেন, শেষ সিদ্ধান্তে এসে যখন সে উপনীত হল, যাকে খারাপ বলা হচ্ছে সে পথে সে যাবেই। কারণ যাই বা না-যাই বদনাম তো আমার হয়েই গেছে। এই বলে সে পরেরদিন সকাল থেকে যা যা করার হয়তো করতে আরম্ভ করল। আমরাও যদি সারারাত বসে এই কথাটা ভাবি, খারাপ তো হয়েই গেছি, আর কোনও উপায় নেই, তাহলে চলো কাল সকাল থেকে বেরিয়ে পড়ি হিংসার পথে। এই জায়গায় আমি মনে করি সচেতনতার একটা ভূমিকা আছে। আমার কিন্তু খারাপ হওয়ার পথ থেকে পরিত্রাণ নেই। এরই মধ্যে ওই একটু যদি কম করা যায়, দু’হাজার মাইক্রোবকে যদি কোনরকমে বাঁচাতে পারি, এর থেকে বেশি কিছু করা যাবে কিনা আমি জানি না। প্রজাতিগতভাবে আমরা এই জায়গার মুখোমুখি আছি। এই হল আমার একটা কথা।

তারপরে একটা কথা বলার। কোন কিছুই না মারতে পারলে ভালো। সেইটা ধরে নাও আমি ভীতু লোক বলে। আমি মশা মারতে পারি কারণ আমার গায়ের জোরে কুলোয়। সুন্দরবনের বাঘ মারতে পারি না, গায়ের জোরে কুলোয় না বলে। কাজেই মশা মারব আর বাঘ মারব না এটা কোনও কথা হয় না। জয়সিংহের মতো ব্যক্তিগত পাপ স্খালনের অছিলায় আমরা যে যার মতো যুক্তিও হয়ত খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু তাতে রঘুপতির জবাব হবে না। আর একটা ঘর আছে হিংসার, যেটা প্রায়

দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, চোখেও পড়ে না, যা নিয়ে আমরা বিষন্ন পর্যন্ত হতে পারি না, সেটা হল হিডেন ভায়োলেন্স, সুপ্ত হিংসা। এটাও কিন্তু আমাদের প্রায় সমস্ত আচরণের মধ্যে, আমাদের মনোভঙ্গির মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে ভাবনা ইত্যাদি আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছি, সেইখানে আমাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়া অসম্ভব জরুরি বলে আমার মনে হয়। কারণ ছোটোবেলা থেকেই তো আমরা একধরনের শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্যে বড়ো হচ্ছি তারই মধ্যে একেবারে অজানা, অচেনা অবস্থায় গোপনে ভায়োলেন্স — হিংসার থেকে বোধহয় ভায়োলেন্স শব্দটাই ভালো — বাসা বেঁধে আছে, যার থেকে পরিত্রাণ নেই।

আমার চোখে দেখা একটা গল্প দিয়ে বলি। আমি যে আবাসনে থাকি, ঠিক তার পিছনে বাচ্চাদের একটা ইস্কুল আছে, খুব সম্প্রতি ইস্কুলটা পাশে অন্য বাড়িতে চলে গেছে, আমি কয়েক বছর আগের কথা বলছি। আমাদের বড়ো গেটটা দিয়ে ঢুকে মায়েরা অনেকে সংক্ষেপ করে চলে যান। একদিন আমার জানলায় বসে দেখা একটা দৃশ্য। বাচ্চার পরীক্ষা ছিল, ওই ছোটো বাচ্চা তারও পরীক্ষার একটা প্রশ্নপত্র। সেদিন বোধহয় বাংলা পরীক্ষা ছিল। মা প্রশ্নপত্রটা হাতে ওকে সন্ধি সমাস কোনটায় কী লিখেছে জিজ্ঞাসা করতে করতে যাচ্ছেন আর ও আলগোছে অন্যমনে কিছু উত্তর দিতে দিতে যাচ্ছে। তার চেয়ে আমার কাছে যেটা ইন্টারেস্টিং, আমাদের আবাসনের মধ্যে অনেক নারকেল গাছ আছে, সেই নারকেলের মুচি পড়ে থাকে, ও ওইরকম একটা পেয়েছে, তা নিয়ে ফুটবল খেলতে খেলতে যাচ্ছে। খেলতে খেলতে একটা শট রাস্তা বরাবর সোজা না গিয়ে একটু বেঁকে গেছে। ফলে ও রাস্তা থেকে নেমে মাঠে নেমে গেছে। ওর মনে তো মুচি। মাও বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পরে তাকিয়ে দেখেন, এতখানি গ্যাপ হয়ে গেছে। মা তো রেগে ... আমার দেখে মনে হয়েছিল, এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভায়োলেন্স আছে ... আমি সেটা একটা পত্রিকার জন্য তখন লিখেওছিলাম, পত্রিকা সম্পাদকের খুব একটা মনঃপুত হয়নি। আমাদের চলাফেরায় চোখ খোলা রাখলে দেখব, এই ভায়োলেন্স প্রতিদিন কী প্রচণ্ড সব কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। ওই বাচ্চার তো নারকেলের মুচিতে লাথি মারবারও অবকাশ নেই। ওর পরীক্ষা দিয়েও মুক্তি নেই। পরীক্ষা দেওয়ার পর কোনটা ঠিক লিখলি, কোনটা ভুল লিখলি ... তারপর ওর সহপাঠীর থেকে যদি দু'নম্বর কম পেয়ে যায়, তাহলে ওর কপালে কী আছে, কে জানে! এই জিনিসটা যেদিন থেকে ও ইস্কুলের ঘরে ঢুকল, তার পরদিন থেকে শুরু হয়ে গেল। এও তো এক সাংঘাতিক কাণ্ড। তার সঙ্গে সাম্প্রতিককালে আরও অনেক কিছু যোগ হয়েছে ... রিয়েলিটি শো নিয়ে যা ঘটছে, তা নিয়ে খবরের কাগজে আপনারা প্রচুর পড়েছেন। তা এতদূর গড়িয়েছে, পার্লামেন্টে এ নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। এই প্রোগ্রাম বন্ধ করার দাবি উঠেছে। এটা লক্ষণীয় যে বন্ধ করার কথা এই দৃষ্টিতে নয় যে এটা একটা ভায়োলেন্স, এই দৃষ্টিতে যে এটা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এই ঐতিহ্যটা হচ্ছে, আমার অন্দরমহলে যা-ই থাক, সেটা যেন জনপরিসরে না আসে। ওই শোয়েতে একেবারে সোজাসাপটা আঁতের কথা প্রশ্ন করা হয়, সেটা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। রিয়েলিটি শোয়েতে কী হয় এই প্রতিটি প্রোগ্রামে কমপিটিটিভ ব্যাপারটাকে এমনভাবে প্রজেক্ট করা হচ্ছে অসম্ভব সফিস্টিকেটেড, অসম্ভব ভায়োলেন্ট। নিউক্লিয়ার বোমার ভায়োলেন্স আমাদের যা হোক একটা মোটামুটি আন্দাজ হয়েছে, কিন্তু এইরকম বহু ভায়োলেন্সের নজির আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রয়েছে এবং ক্রমাগত জড়িয়ে যাচ্ছে — যেটা কিন্তু আমরা ভায়োলেন্স বলে চিনতেও পারছি না। এখন এইখান থেকে কথা বলতে আরম্ভ করলে এতদূর গোড়া ধরে টান পড়বে যে আমাদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলা ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না।

এইবার আমাদের একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে ভায়োলেন্সটা কী? কোনও জিনিসেরই সংজ্ঞা দেওয়া ভীষণ শক্ত কাজ। কিন্তু সংজ্ঞার মতো না করেও একটা আঙুল রাখার মতো চিনে নেওয়া যেতে পারে এইভাবে, সব কিছু মানানসই বুঝসই হচ্ছে এরকম একটা আমাদের পরিণত মানুষ হিসেবে মাথায় আছে, সেইটাকে যখন একটা ধাক্কা দেওয়া হয় — আমি যদি এখন হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সিলিং ফ্যানটা ধরে একটা কিছু করতে যাই, অদ্ভুত লাগবে — অর্থাৎ আমাদের সকলেরই কিন্তু বোধের একটা সীমানা আছে, সেইটা অতিক্রম করা হল ভায়োলেন্স। আজকে সেইটা কীরকম ছাড়িয়ে গেছে — পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে বাচ্চা নারকেলের মুচিতে লাথি মারবে, সেটা আর আমার কাছে খুব সঙ্গত মনে হচ্ছে না। আমি যদি কাউকে মারি আর বলি ক্ষতি কী হচ্ছে, সকলে মিলে যদি বলি ক্ষতি কী হচ্ছে .... যেমন, ওই বইটার কথা বলা যায়, 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বৌ'-তে লেখিকা লিখেছিলেন ওখানে প্রত্যেক বাড়িতে মোটামুটি বিবাহিতা মেয়েদের দৈনিক একটা মারধোরের কোটা আছে, স্বামী বাড়ি ফিরে খানিকটা মারবে, এপর্যন্ত কেউ এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। ওই বইতে ওঁর নিজের ওপর যা হয়েছে তার যে বর্ণনা আছে, সেটা আমরা কিন্তু এখানে বসে বিনা বিতর্কেই মেনে নেব ভায়োলেন্স বলে। যেমন একটা দূরত্ব পর্যন্ত ওঁকে টেনেহিঁচড়ে কাঁকড়-টাকড়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। ... বইতে ওই মহিলা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তিনি কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে এলেও বিয়ে ভেঙে আসেননি এবং ওই যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই চান, তাঁকে অন্য নানাদিকের জন্য অত্যন্ত শংসাপত্রও দিয়েছেন। কাজেই ভায়োলেন্স কীভাবে আসছে দেখুন, ওই কাজগুলো ওই সময়ে ওই সমাজে ওই স্থানে ভায়োলেন্স হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে না। আমাদের কাছে অন্তত তা নয়। কাজেই সমস্ত সময় স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে একটা সংজ্ঞা করা যাবে তা নয়। ওই মুচির গল্পটাই অন্য এক পরিস্থিতিতে ধরা যাক। ভদ্রমহিলার বাড়িতে কারও অসুখ করেছে, বাড়িতে দেখবার লোক নেই, বাচ্চাকে নিয়ে ফিরছেন, বাচ্চাটা মুচির আকর্ষণে মূল রাস্তা থেকে মাঠে নেমে পড়েছে বলে তিনি যদি ওকে তিরস্কার করেন, আমরাই কিন্তু তখন সেটাকে আর ভায়োলেন্স হিসেবে বিবেচনা করব না। এই বোধে আমাদের হাত রাখতে হয়, এই বোধ দিয়েই আমাদের কোনটা ভায়োলেন্স আর কোনটা নয় ঠিক করতে হয়। যেমন, বাচ্চা রাত্রে পড়তে গিয়ে ঘুম পেয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়ছে। আমি তাকে দরকার মতো খুঁচিয়ে জাগিয়ে রেখে দু'এক ঘা — একেবারে বাচ্চাদের দেওয়া হয় বলে আমাদের চেনাজানা বৃত্তের মধ্যে খবর পাইনি — একটু বড়ো হলেই বাচ্চাদের নানারকম ঘুম ভাঙানোর ওষুধ-টষুধ তো ছিল, এখনও আছে, একটু বোধহয় কমেছে, জানি না। উল্টো ভায়োলেন্সের গল্পও আমার চেনা বৃত্তের মধ্যেই রয়েছে। ধরা যাক এই গল্পটা। একটু আর্থিক অসুবিধার পরিবারের এক যুবক ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করেছে। বাবার টিপিকাল বক্তব্য, ছেলে বিএসসি পাশ করেছে, এবার একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিলেই হয়, আমি আর কত টানব। যুবক ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে, সে আরও পড়তে চায়। তার এক দাদা যুবককে মদত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি-তে ভর্তি করে দেন। ফলে সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, বাড়ি এসে বাড়ির লোকেরা ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রে পড়াশুনা করে। বাবা টের পেলেই ঘরে এসে সুইচটা অফ করে দেন। এটাও একটা ভায়োলেন্স। তাহলে এগুলোর প্রত্যেকটাকেই ভায়োলেন্স বলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু সংজ্ঞা দিতে গেলে একটু অসুবিধে হয়।

এখানে ভায়োলেন্স শব্দটা ব্যবহার করা ভালো সম্ভবত এই কারণে, হিংসা শব্দটা আমরা বলে বলে, চোখে যে ছবিটা আসে — যেমন,

স্কুলের বাচ্চাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, ডাস্টার ছুঁড়ে মারা হচ্ছে, তাতে কেউ অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, দু'একজন মারাও যাচ্ছে — এগুলোকে হিংসা বলে মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না। কিন্তু অন্য যেগুলো, সুপ্ত বা অদৃশ্য, সেগুলোতে তো আমরা হিংসা শব্দটা ব্যবহার করি না। কিন্তু ভায়োলেন্স শব্দটার যে ব্যবহার তাতে এগুলো সহজে এসে যায়। এটাকে আমাদের আলোচনার মধ্যে যুক্ত করা আমার কাছে মনে হয় খুব জরুরি। কারণ সমাজটাতে তো আমরাই আছি, ভালো-মন্দ আমরাই করছি, যৌথ বাহিনী আমরাই করছি, মাওবাদীও আমরাই করছি। তাই আমাদেরটা কী হবে, এটা আমাদের দেখা দরকার।

এক্ষেত্রে তিনটে ধারণা যদি আমরা একটু মাথায় নিয়ে ভাবি, তাহলে আমার যখন ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছে করছে তখন খানিকটা বোধহয় — নিস্তার বা পরিত্রাণ পুরোপুরি হবে এরকম তো আমি মনে করি না — নিজেকে সংযত করতে পারি। আমি ভারতীয় ধারণা, পাশ্চাত্য ধারণা এরকম আলাদা-টালাদা করছি না, সম্ভবত এগুলো মিশেই আছে। তিনটে শব্দ যদি আমি বলি, একটা হচ্ছে ঋত, আর একটা হচ্ছে ঋণ, আর তৃতীয়টা হচ্ছে সাম্য। এই তিনটে আমি একটু সাজাতে চাই এভাবে যাতে ভায়োলেন্সের প্রশ্নটাকে অ্যাড্রেস করতে তা আমাদের খানিকটা সাহায্য করতে পারে। ঋত-র ধারণাটা যে আমি বুঝি তা মনে করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অনেকদিন ধরে আমার মাথায় এটা রয়েছে। ঋত ভারতীয় দর্শনের খুবই ব্যাপক ধারণা, নানান জায়গায় এটা ছড়িয়ে আছে। যদি কেউ উদ্যমী হয়ে অভিধানগুলো দেখে সেখানেও এর নানান মানে পাওয়া যেতে পারে। একটা অর্থে ঋত শব্দটা সোজা, মানে হল সত্য বা ট্রুথ। কিন্তু যে প্রসঙ্গে আমি এটাকে ব্যবহার করতে চাই, সেটা আরও ব্যাপক। একটা মহাজাগতিক বিন্যাসের কল্পনা, সব কিছুর একটা অর্ডারের কল্পনা। কেউ বলতেই পারেন এটা মেটাফিজিকাল ধারণা, অবশ্যই তাই। এইবার যে কোনও দৃষ্ট জিনিস, বস্তু বা ব্যক্তি, তাকে দেখবার, বোঝবার, ভাববার সময় একটা বিন্যাস, একটা ফ্রেম এটা দরকার ... একটু আগে যেটা বললাম, বাচ্চা লাফ দিলে আমার ধাক্কা লাগে না, কিন্তু আমি হঠাৎ এখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লে আমার ধাক্কা লাগে। যে মেটাফিজিকাল চিন্তা থেকে এভাবে ভাবা হচ্ছে, সেটা একটা বিন্যাসের টার্মসে গিয়ে বুঝতে পারা যায়। যেগুলো আজকাল বিজ্ঞানের ভাষাতে এভাবে বলা হয় কোথাও একটা কোন ডিস্টার্বেন্স, পার্টার্বেশন জেনারেট করলাম ... উত্তর মেরুতে একটা কিছু জেনারেট করলাম সুন্দরবনের আইলার ক্ষেত্রে গিয়ে তার প্রভাব টের পাব। সত্যি কথা বলতে কী আমাদের সুনামি, সেটা না হয় একটু ঘরের কাছে ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু হয়েছিল। এইবার ঋত-র ধারণা যেটাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে, সেটা কিন্তু একটা বিরাট মাপের বিন্যাস, যা কেউ হয়তো চোখে দেখতে পাবে না, কিন্তু এই বিন্যাসের ধারণাটা কাজে লাগে। এবং ওই অর্থে শাস্ত্রচিন্তা, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন, গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়, বর্জিতব্য কিনা — এই সমস্ত বিচারে কিন্তু একটা বড়ো মাপকাঠি আছে, ঋতের সঙ্গে যোগটা কীভাবে হচ্ছে তা বিচার করা। যে কারণে মহাভারত ইত্যাদিতে এমন বহু ঘটনা পাই যা আমাদের সচরাচর নীতি-নৈতিকতার মানে বিচার করলে এত অদ্ভুত, এত অন্যায় মনে হবে। মনে হতেই পারে তারা ওই পরিমাণ অন্যায়ের কথা ভাবছেন কী করে? তার একটা সম্ভাব্য উত্তর, যে অর্ডারে আমরা ওটা দেখছি, তারও পিছনে অন্য কোন বড়ো অর্ডার আছে, যেখানে ওই ছোটোখাটো ন্যায়-অন্যায়ের তাৎপর্যই বদলে যাবে। কেন আমি এই কথাটা বলছি, যদি আমরা এই ধরনের ভাবনায় খানিকটা শরিক হতে পারি, তার সঙ্গে যদি ঋণ কথাটা যোগ করে নিই, তাহলে একটা বোধের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেটা হল, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অসম্ভব ঋণী। এই কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। কীরকম ভুলে থাকি, এই মেটাফর দিয়ে বলা যায়, বিজ্ঞান আমাকে শেখাচ্ছে যে আমার এই চামড়ায় প্রতি বর্গইঞ্চিতে এক বিরাট পরিমাণ চাপ আছে। সেই চাপটা তো আমি টের পাচ্ছি না। অন্য সমস্ত সাম্যাবস্থার জন্য সেটা আমার শরীরে সয়ে যাচ্ছে। তেমনি এই ঋণের কথাটা। এখানেও আমার ঋণের বোধ আমাকে সদাসর্বদা পীড়িত করা উচিৎ। কিন্তু অনেকগুলো কারণের জন্য তা হয় না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, মনোভঙ্গি সব মিলিয়ে একটা চাপ সৃষ্টি করছে। এর পেছনে একটা কেন্দ্রীয় ধারণা বাজারভিত্তিক অধিকারের বোধ থেকে আসছে। আমি এই বোতল থেকে জল খেতে পারি। কেন? কারণ আমি বাজার থেকে পয়সা দিয়ে সেটা কিনেছি। আমরা চিনি না এমন একজন, যার তৃষ্ণা আছে, ঘরে ঢুকে এইটাতে হাত দিতে গেলে, আমরা বলব, কী হচ্ছে? কারণ আমি তাকে গ্রহণ বা অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। তৃষ্ণাটা এখানে বড়ো ঘটনা নয়, বড়ো হচ্ছে বাজারের অঙ্কে অধিকারবোধ। এটা এতটাই সহজাত আমাদের হয়ে গেছে, তৃষ্ণা-ক্ষুধা-পরিচ্ছেদ-বস্ত্র-আবাসন ইত্যাদি — এই যে একেবারে বস্তুগত প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে ক্রমাগত আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে। প্রক্রিয়াটা প্রায় অদৃশ্যভাবে অন্তত কয়েকশ বছর ধরে তো ঘটল, এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে প্রয়োজন বা নিড হাসির প্রশ্ন হয়ে গেছে। তৃষ্ণা পেয়েছে বলে কেউ যদি বলে জল খাচ্ছি, আমরা হেসেই উড়িয়ে দেব — মানে? এই জলটা তো আমরা এনেছি। আমরা কখনোই প্রায় এই কথাটা ভাবছি না, সমস্ত কিছুই আসলে সকলের। এইজন্য আমি ঋতের ধারণাটা এনেছি — ঋতের মধ্যে কিন্তু প্রাণী-অপ্রাণী সব পড়ছে। ঋতের মধ্যে কিন্তু জড় একইরকমভাবে আসছে। জড় আর চৈতন্যের মধ্যে বিভাজন করে চৈতন্যকে হায়ারার্কিকালি অ্যারেঞ্জ করা, তা কিন্তু ঋতের ধারণায় নেই। ঋতের ধারণার মধ্যে আমি যতটা দেখতে পাই, সমস্ত কিছুর মধ্যে তোমার একটা ক্ষেত্র একটা কোণে রয়েছে। কাজেই তুমি কিন্তু সব সময়ই কুণ্ঠিত, ঋণগ্রস্ত — এই বোধে যদি তুমি থাক — তাহলে আমাদের অনেক কিছু করার আছে।

এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় একটা কথা বলতেন, আমি বেশ কয়েকবার ওঁর কাছে শুনেছি। তিনি কেন ছড়া লিখতেন? একাধিক সভাসমিতিতে উত্তরটা দিতেন — আমি ভেবে দেখলাম, আমি তো আসলে কিছুই পারি না, আমি ধানচাল ফলাতে পারি না, জামাকাপড় বুনতে পারি না, আমার যা যা লাগে তার প্রায় কিছুই আমি করতে পারি না, সবই তো আমাকে অন্যেরা করে দেয়। আমি অন্যদের জন্য কী করতে পারি? তিনি ভেবে ভেবে ওঁর একটা উত্তর — জয়সিংহের মতো, জয়সিংহ ভেবেছিল, আমার শরীরে রাজরক্ত আছে, তাই আমি কিছুটা দিতে পারি, উনি ভাবলেন আমার কলমে ছড়া আছে, আমি ছড়া লিখব। একথা বলে তিনি যেটা যোগ করতেন, আমি কুকুর বেড়াল পাখি ফড়িং এসব নিয়ে ছড়া লিখব। ওঁর ভাবনা অনুসারে উনি ঋণের কথাটা বলেননি, অন্তত আমি শুনিনি, কিন্তু উনি এইভাবে সম্পর্কের কথাটা বলেছিলেন। এটা আমাদের যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, তা হল, সম্পর্কের কথা। আমি কিন্তু আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে আছি। আর অধিকারবোধের এই যে কথাটা বললাম, বাজারভিত্তিক ... অধিকারবোধের রাজপথ আমাকে প্রয়োজন থেকে সরিয়ে ক্রমাগত যেখানে ঠেলে দিচ্ছে।

এখন সুন্দরবনে অনেকে ত্রাণের কাজ করছেন। ত্রাণের প্রসঙ্গে এই প্রয়োজনের কথাটা ভালোভাবে খেয়াল করা যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান ওঁর একটা লেখায় কথাটা বলেছেন। বন্যার সময় ত্রাণ নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁরা শিক্ষক শিক্ষিকা আর ছাত্রছাত্রীরা। প্রয়োজনের তুলনায় যেটুকু ত্রাণ নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তা ছিল যথেষ্ট

কম। স্বাভাবিক। শাড়ি বন্টন করা নিয়ে সংকট দেখা দিল। সবাই চাইছে, মাত্র কয়েকটা শাড়ি হাতে। ওঁরা বয়স্কা একজন মহিলার হাতে ওঁদের সংগ্রহের সবকটা শাড়ি তুলে দিয়ে বললেন, মাসিমা আমাদের যা দেওয়ার আপনাকে দিয়ে দিলাম, এবার আপনি যাকে যা দেওয়া প্রয়োজন সেটা দিন। আপনি তো এঁদের সবাইকে জানেন। এটা ওঁর মতো একটা এসকেপ রুট। প্রয়োজনের কথা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি। পার্টি, রাজনীতি সেখানে ক্রমাগত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই জায়গায় আমি সাম্যের কথাটা আনব। সাম্য বলতে যে অর্থ আমাদের বেশি চেনা সেটা হল সমতার অর্থ। সেই অর্থের সঙ্গে জড়িয়েই কিন্তু একটা অন্য অবস্থা আছে, যেটা আমরা এইরকম ধরনের প্রসঙ্গে ব্যবহার করি, যেমন, লালগড়ে আপাতত একটা সাম্যাবস্থায় পৌঁছানো গেল। এইবার সাম্যাবস্থা এবং সাম্য, মূল জায়গায় চিন্তাটা কিন্তু একই আছে। একটা সমতা। আমি খুব অস্থির বোধ করছি। যতগুলো চিন্তা–ভাবনা–বিবেচনা আমাকে পীড়া দিচ্ছে, আমি খুব অস্থির অবস্থায় আছি, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। যখন তা নিতে পারলাম, কোন একরকম সাম্যাবস্থায় বা সমতায় পৌঁছালাম। এই সমতা মানে কি ইকুয়াল? এটা একটা ইকুইলিব্রিয়াম। সমতার সঙ্গে জড়িয়ে যে সাম্যাবস্থার চিন্তা, তা যে সব সময় ইকুয়াল হবে তার কোনও মানে নেই। ন্যায্য অবস্থা হলেই চলবে। এখানে পাটিগাণিতিক সমতার প্রশ্ন উঠবে না। তা যে ওঠে না, এমনিতেই দেখছি আমরা। আমাদের আধুনিক আলোচনার মধ্যে অনবরত সংরক্ষণের যে কথাটা উঠে পড়ছে — মেয়েদের সংরক্ষণ, দলিত সংরক্ষণ, যে কোন অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ — ওটা এক ধরনের ইনইকুয়ালিটি। ওই ইনইকুয়ালিটিকে তুমি সমর্থন করছ কেন? দীর্ঘদিন ধরে যে বঞ্চনা ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে হয়ে এসেছে, তার জন্য তুমি আজকে একটা কৃত্রিম উপায় বার করছ, খানিকটা অসাম্যের মধ্যে সাম্যে পৌঁছানো। কাজেই প্রশ্নটা কিন্তু পাটিগণিতের অঙ্কের সমতা নয়। সাম্যের মূল ধারণাও তা নয়, মূল ধারণা ন্যায্যতা।

সাম্যাবস্থার কথাটা আমি আরও একটু আনতে চাইছি, বিশেষ করে ভায়োলেন্সের প্রশ্নে। আমরা অনেকসময় ভায়োলেন্স নিয়ে যখন আলোচনা করছি, তখন সংগঠিত রাজনৈতিক দল, সংগঠিত পাড়ার ক্লাব, মাফিয়া গোষ্ঠী এই চেহারাটা সহজে আসে। অন্য যেটা অত সহজে আসে না, সেটা হচ্ছে ব্যক্তি হিসেবে ... ব্যক্তি হিসেবে সকাল থেকে রুটিন যদি হিসেব করি, কত ভায়োলেন্স আমরা করে চলেছি। ভায়োলেন্স সবসময় আমরা হাতেনাতে করছি তা নয়, কিন্তু পজিশন নিচ্ছি। পারিবারিক ভায়োলেন্স, স্কুলের ক্লাসঘরের ভায়োলেন্স। ক্লাসে অনবরত আমরা ছাত্রের প্রশ্ন চেপে দিচ্ছি, ছাত্রের মাথায় হয়তো অনেকদিন ধরে একটা প্রশ্ন ঘুরছে, কিন্তু ওটা আজকে শিক্ষক হিসেবে আমার টপিক নয়, আমি হয়তো তেমন তৈরিও নয় ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে, আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। যেটাকে ভালো বাংলায় বলা হয় ব্যক্তির বিশেষ অধিকার — প্রেরোগেটিভ অব এ টিচার। এইরকম প্রেরোগেটিভ তো অহরহ ব্যবহার করছি আমরা। এইগুলো যদি আমরা ভায়োলেন্সের বর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তাহলে আমরা দেখব, আসলে আমি আমার নিজের মধ্যেকার সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুত। আমার কতরকম কর্তৃত্বের প্রয়োজন পড়ে, আমি মানুষ তো। কাজেই আমার একটা মন বলে, আমি ওই তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল খেতে বাধা দিতে গেলাম। আর একটা মন অস্বস্তি বোধ করে। সেই কারণে আমার পকেটে যদি বাসে কেউ হাত দেয়, বাধা দেওয়ার জন্য আমার পকেটে হাতটা চলে যায়। ভাবলে নাও যেতে পারত। ভায়োলেন্সের সঙ্গে আমি এটাকে যোগ করছিলাম ওই জায়গায়, আসলে ঋতের ধারণা থেকে আমরা দীর্ঘদিন এতটাই বিচ্যুত যে ঋত শব্দটাই আর আমাদের কাছে প্রায় নেই। সমীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, বড়ো জোর সত্য অর্থটা পাওয়া যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই শব্দটার মানেই নেই। মানেটা হারিয়ে গেছে। সত্য অর্থটা যদি দু'চারজন বলতেও পারে, অন্য অর্থটা কিন্তু নেই। কারণটা কী? আমাদের শিক্ষাদীক্ষা — কমন উইসডম যাকে বলে — এসবের মধ্যে তো এই শব্দটা আসেনি। যেমন, কমন উইসডমে আমরা পেয়ে যাই, পৃথিবী গোলাকার। সত্যি সত্যি পৃথিবী গোলাকার, এটা কি আর আজকে কেউ প্রমাণ দেখে বলি? পেয়ে গেছি কমন উইসডমে পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু ঋতের ওই ধারণাটা মাঝপথে আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। এটা একটা কথা। এবার ঋত যদি আমার কাছে থাকত, তাহলে ঋণের প্রসঙ্গে সম্পর্কের কথাটায় আমি ফিরতে পারতাম। কেন সম্পর্কের কথায় ফেরা জরুরি মনে করছি? এইজন্য, কারণ অধিকার বা বাজারভিত্তিক সমগ্র ধারণা, আমার যে তথাকথিত জীবিকা বা উপার্জনের বিষয় ছিল, তার মধ্যে এফিসিয়েন্সির ধারণা খুব জরুরি। এটা একেবারে শিরোধার্য করে এগিয়েছি সর্বত্র — এফিসিয়েন্সি না হলে আমার চলবে কী করে? সরকারি বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোনও কিছুর ভর্তুকির কথা উঠলেই আনন্দবাজার থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকান সর্বত্র সরগরম হয়ে ওঠে — ভর্তুকি দিয়ে কি দীর্ঘদিন চলতে পারে নাকি? এফিসিয়েন্সি কথাটা যদি আমরা বাড়িতে বসে চিন্তা করি, তাহলে দেখব 'এফিসিয়েন্সি' কিন্তু তোমাকে 'প্রয়োজন' থেকে সরিয়ে নিতে প্রায় বাধ্য। ঠিক যেভাবে বাজারের অধিকারবোধের ধারণা দিয়ে যে মানুষের তেষ্টা পেয়েছে তাকে জলপান করতে দিইনি। কারণ তার বাজারের অধিকার নেই। এটাই তো অমর্ত্য সেনের এনটাইটেলমেন্ট–এর ধারণার মূল কথা। খাদ্য তেতাল্লিশের মন্বন্তরে ছিল, কিন্তু খাদ্যের অধিকার ছিল না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বলা হয়, খাদ্য উৎপাদনই কম হয়েছিল। তেতাল্লিশে তা বলা হয়নি। অধিকারবোধ আমাকে যেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে অধিকারের হাইওয়েতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ... আমার মনে মনেই বা কী জাস্টিফিকেশন — পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি। আমি পয়সা না দিলে তো ওরও জীবিকা সফল হবে না। কাজেই আমার বিবেকও এখানে খুব শান্ত। আমি পয়সা দিচ্ছি বলে ওরও প্রয়োজন মিটছে। এই যে অর্ডার, ঋতের ধারণার মধ্যেও কিন্তু একটা অর্ডারের ধারণা রয়েছে, অত ওপর থেকে নয়, একেবারে ভেতর থেকে। ঋত আর ঋণকে মেলাতে চাইছি ওই কারণে। সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে — আমরা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ কোনও কিছু ভাবি, তখন ব্যক্তি পাশে থেকে যায়। ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে এসে একটু নাড়াঘাটা করে দেখা দরকার। সেইটা দেখলে দেখা যায়, সাম্যাবস্থার এতই তীব্র অভাব ঘটেছে, আমি যা করছি — অস্তিত্ববাদী দর্শনের টার্ম ব্যবহার করে বলা যায় — সেগুলো আর অথেনটিক নয়। আমি তো আর সাম্যাবস্থায় নেই। টগবগ করে ফুটন্ত অবস্থায় কী করে বসছি, সেটা আর আমার অথেনটিক অ্যাকশনও হচ্ছে না ... যে কারণে লক্ষ্য করুন, রাজনৈতিক মঞ্চে আমরা যে বক্তৃতা করছি, নেমে গিয়ে পার্টি অফিসে গিয়ে নিজেরাই আলোচনা করছি — এই তো বলে এলাম, আমার তো আর কিছু করার নেই, পার্টি লাইন। এই কারণে যে শাসকদলেরা আজ সঙ্কটে পড়েছেন, তাদের ঘর আর বার বেরিয়ে পড়ছে, সামলানো যাচ্ছে না। ঘর আর বার সামলানো যেত তখনই, যতদিন এক ধরনের সেম্বলেন্স অব অর্ডার ছিল। সেটা আজ — সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের পরে — আইলা ঝড়ের মতো এক ঝড়ে এতই বিপর্যস্ত যে মেলানো যাচ্ছে না। ফলে একই জিনিস কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আমরা দেখছি, এতটাই অবিন্যস্ত হয়ে আছি সাম্যাবস্থার অভাবের মধ্যে যে আমাদের কোনও চিন্তা আর তেমন করে পৌঁছোচ্ছে না কোথাও। ঋত কথাটাও যদি বলি, দুবেলা এত অসত্য কথা বলতে বাধ্য হই, তাহলে আমার অসাম্যাবস্থার সঙ্কট তো আরও গুলিয়ে যাচ্ছে।

ভায়োলেন্সকে অ্যাড্রেস করতে গেলে এই কথাগুলো যদি আমরা নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করতে পারি, হয়তো কিছু কাজে লাগবে।

অনিন্দ্য দত্ত : মনুষ্যজগতে সকলকেই আমরা ইকুয়ালি ভায়োলেন্ট আমরা দেখছি। মানুষ দু'হাত খালি করে মাথা তুলে দাঁড়ালো, শিরদাঁড়া সোজা হল, ব্রেনের ওজন বাড়ল, ওটাই ভায়োলেন্স হতেই হবে অনিবার্যভাবে তা নয়, পজিশনটা ভায়োলেন্ট। বাঘ এবং সিংহের মধ্যে সিংহ খিদে না পেলে কাউকে মারে না, কিন্তু বাঘ যখন-তখন মারে। হরিণ তো কাউকে মারে না, পাখিদের তো প্রশ্নই নেই। মানুষের মধ্যে একটা পোটেন্সিয়াল ডেস্ট্রাক্টিভনেসের ব্যাপার এসেছে, আবার উল্টোটাও সত্যি। এখন লেস ডেস্ট্রাক্টিভনেসের প্রশ্নে, পলিটিকাল পার্টি, বামপন্থীদের গোড়াতেই একটা ভুল হয়েছে, যেটাকে ওরা ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম বলেছে, তাতে ডেমোক্রেসি আর থাকত না, সেন্ট্রালিজম প্র্যাকটিস হয়েছে। গোড়াতেই তা হয়েছে এমন নয়। কিন্তু কালক্রমে যেটা হয়েছে, ডেস্ট্রাক্টিভনেসটা কমিয়ে অন্যটা বাড়ানো, তার ক্ষমতাই রইল না। ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান। ...

শমীক সরকার : ভায়োলেন্স কি আগের তুলনায় কমেছে না বেড়েছে?

সৌরীন ভট্টাচার্য : কমেওছে বটে, বেড়েওছে বটে। এক ধরনের ভায়োলেন্স হয়তো কমেছে, অন্য ধরনের বেড়েছে। কৌটিল্যের আমলের মতো কান কেটে নেওয়া, নাক কেটে নেওয়া আজ হয়তো নেই। কিন্তু সমাস, সন্ধি ভুল করলে বাচ্চাদের কী হচ্ছে? আগে এসব ছিলই না হয়তো।

কাজল মুখার্জি : নারীভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে।

সৌরীন ভট্টাচার্য : টেকনিকটা পাল্টেছে।

অনিন্দ্য দত্ত : নরওয়ে ...।

কাজল মুখার্জি : আমার যেটা মনে হয়, হিংসা এটাই, আমি বা আমরা, সামাজিক কারণেই হোক বা ঐতিহাসিক কারণেই হোক, যে যে ধারণাগুলি করি, সেই ধারণাগুলির সাথে যে যে ধারণা মেলে না, এই যে দুটো বর্গ তৈরি হল, এই সম্পর্কের মধ্যেই ভায়োলেন্সটা রয়ে গেছে। আমার থেকে যে একটা অপর তৈরি হচ্ছে, আমার মতো নয় যারা, সেখানে আমি কীভাবে ঢুকছি, ঢোকাটা যত ভয়ানক হবে ভায়োলেন্সের মাত্রাটা ততই ভয়ঙ্কর হবে।

শমীক সরকার : ঢোকাটা ভয়ঙ্কর হবে মানে বুঝতে পারলাম না।

কাজল মুখার্জি : মনে কর, ইসলামিক আইন যেখানে আছে, শরিয়ত আইন যেখানে আছে, সেখানে মেয়েরা যে বোরখা পরছে, তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব — তার ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখছে এবং তার ওপর বোরখাটা চাপিয়ে দিয়েছে। এটা অবশ্যই একটা ভায়োলেন্সের উদাহরণ। কিন্তু যদি আমি উল্টোটা দেখি। তুরস্কের একজন মহিলা এমপি, যেহেতু তা 'সেকুলার', বোরখা পরে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে পার্লামেন্টে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এটাও ভায়োলেন্স। ব্রিটেনের এক ছাত্রী 'ইয়ং মুসলিম' নামে এক পত্রিকায় এক বিরাট প্রবন্ধে লিখেছিলেন, বোরখা পরা আমার অধিকার।

সৌরীন ভট্টাচার্য : সম্ভবত এখানে প্রশ্নটা হবে, এই যে অপর, একে আমি কীভাবে গ্রহণ করব?

কাজল মুখার্জি : যদি আমি তাকে স্বীকৃতি দিই, তাহলেই ভায়োলেন্সের মাত্রাটা অনেক কমে গেল। পরিবারে যখন একটা মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসে, তখন সে একজন আউটসাইডার। পরিবারের কোডগুলি যখন তাকে মানতে বলা হয়, তোমাকে এই এই জিনিস মানতে হবে, সে যদি সেটা না মানে, তখন তাকে ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা, কটূক্তি করা। এগুলো অবশ্যই ভায়োলেন্সের মাত্রা। সেটাই বাড়তে বাড়তে পুড়িয়ে মারা ইত্যাদির দিকে এগিয়ে যায়।

সৌরীন ভট্টাচার্য : অর্থাৎ আমরা অপরকে সহজভাবে গ্রহণ করার মতো কোন প্রস্তুতি দেখাতে পারি না।

কাজল মুখার্জি : এই সংস্কৃতির ওপরই অনেকখানি নির্ভর করছে হিংসার সম্পর্কটা। যেটা পার্টির কথা হচ্ছে, বেশিরভাগ পার্টির হাতে একটা সত্য আছে, একটা প্রজেক্ট আছে। সে সোশাল ইঞ্জিনিয়ারিং করবে। সেই সোশাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টের মধ্যে আমরা — যাদের জনগণ বলে বলা হয় — আসলে তারই মধ্যে নাটবল্টু সব। তার মতো করে নাটবল্টু সাজাচ্ছে, এই সাজানোর মধ্যে যেখানে অসুবিধা হয়ে যায় সেখানে গণ্ডগোল লেগে যায়। যে দল যত আদর্শবাদী হয়, তাদের তরফ থেকে জনগণের সমস্যাটা বেশি হয়। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে সারা পৃথিবীতেই সমস্যাটা বেশি এসেছে, কারণ তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তাদের মতো করেই তারা সমাজতন্ত্র বা সাম্য আনবে। সেইজন্য 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র'গুলোতে কী ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে গেছে। ... আমার মনে হয়, লালগড়েও সমস্যা সেটাই। মাওবাদীরা ধরেই নিয়েছে যে তাদের পথ ছাড়া অন্য যা কিছু ভুল পথ।

সৌরীন ভট্টাচার্য : যে জিনিসটা আপনি কমিউনিস্ট পার্টির মতো বা সোভিয়েতের মতো বিরাট সংগঠনের ক্ষেত্রে বললেন, আমাদের টেররিস্ট বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ক্ষেত্রেও মূলত একই জিনিস ছিল। একটু জেনারালাইজ করে দেখি, আবার যদি আমরা নিজেদের দিকে একটু তাকাই, যে কোনও সংগঠিত প্র্যাকটিসের এই সমস্যা আছে, সংগঠনের সঙ্গে ব্যক্তিও দায়ী হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই মনে করি, অমুক জিনিসটা অমুক রকম হওয়া দরকার। আমরা মনে করি যে স্কুলের দিদিমণিদের সালোয়ার-কামিজ পরে যাওয়ার দরকার নেই। এবার এই মনে করি বা করি না, এই সাবজেক্টিভ জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেদের কোন জায়গায় স্থাপিত করছি।

কাজল মুখার্জি : এই অপরকে দেখা, রিলেশন উইথ দি আদার — ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা গোষ্ঠীগত, আমরা সব সময় এক অবস্থানে থাকি না, কখনও ঘরে থাকি, কখনও বাইরে থাকি, কখনও ব্যক্তি হিসেবে থাকি, কখনও দলে থাকি, কখনও গোষ্ঠীতে থাকি — এর ওপর ভায়োলেন্সের বিষয়টা অনেকখানি নির্ভরশীল। ওই যে ছেলেটি নারকেলের মুচি নিয়ে খেলছিল, তার মায়ের যে ভায়োলেন্স, ছেলেটা তাঁর প্রজেক্টের নাটবল্টু বিশেষ।

আবার এর উল্টো উদাহরণও রয়েছে। মানুষের মধ্যেই সব — সহমর্মিতা, ঋণীভাব — রয়েছে। আমাদের পুরাণ, মিথগুলো কীভাবে অন্যকে দেখিয়েছে এবং সেখান থেকে কীভাবে ভায়োলেন্সগুলো গড়ে ওঠে। উল্টো উদাহরণগুলো যদি প্রচুর পরিমাণে আসে, এখানে শিক্ষার প্রশ্ন, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই যদি শিক্ষার মধ্যে আসে যে অন্যকে তুমি কীভাবে দেখবে — অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা যে কোনও ক্ষেত্রের অন্যকে দেখা যদি না যায়, তাহলে ভায়োলেন্সের এই মৌলিক জায়গাটাকে মোকাবিলা করা যাবে না।

সুজয় বসু : এতগুলো শিক্ষিত লোক আমরা এক জায়গায় বসে ভায়োলেন্স নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের কী করণীয়?

সৌরীন ভট্টাচার্য : এক জায়গায় উত্তর পাবেন, এরকম সরল কোনও পথ নেই। একটা উত্তর হতেই পারে, শিক্ষার সংস্কার করা। এছাড়া, আর একটা উত্তর বলাই যায়, নেশন-স্টেটের কনসেপ্টটা ট্রান্সেন্ড করার চেষ্টা করা যেতে পারে। পণ্ডিচেরীতে অরোভিলে আমি শুনেছি ১৩০টা নেশনের লোকেরা একত্রে থাকে, ওঁদের কোনও নেশন নেই ...।

কাজল মুখার্জি : নেশনের বাইরেও এই যে একটা কমিউনিটির সঙ্গে আর একটা কমিউনিটির যে ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্স, হাজার হাজার লোক মরে যাচ্ছে। এর পিছনে আমি জানি না কার কী ভূমিকা আছে ...।

সুজয় বসু : নেশনের কথাটা তো অনেক পরে। পরিবারে আমাদের বেড়ে ওঠার পর্বে প্রত্যেককেই সুশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তো সমাজ করেছে?

সৌরীন ভট্টাচার্য : না, করেনি। সেটাই তো সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা আরও কোনও কোনও মনীষী চেষ্টা করেছিলেন। সবারটাই হয়তো ব্যর্থ। যেমন, রবীন্দ্রনাথের একটা কথা ছিল, "কেহ যে আদৌ কিছু শিখিতে পারে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না"। অর্থাৎ আপনাকে ছাড় দিতে হবে, ছেড়ে রাখতে হবে।

সুজয় বসু : ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি। বিষয়টাকে ছেড়ে দিয়ে জীবনটাকে ধরি।

সৌরীন ভট্টাচার্য : জীবনটা কেমনভাবে যাপন করবে? সেটা তো আপনার কথায় চলবে না। তাহলেই তো আবার সেই ভায়োলেন্স আসবে। যার জীবন তাকে যাপন করতে দিন।

মিত্রা চ্যাটার্জি : সে তো সাংঘাতিক হয়ে যাবে।

সৌরীন ভট্টাচার্য : এটাই তো মুশকিল। এই যে ঋতের কথাটা এতক্ষণ ধরে বললাম। এই যে ছেড়ে দেওয়ার কথা আমরা ভাবছি, আজ আমরা সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয়ে বাজারের রাজপথে দাঁড়িয়ে একথা ভাবছি। এই যে আমাদের গেল গেল দুশ্চিন্তা, এ তো আমাদের ঋত থেকে বিচ্যুত অবস্থারই প্রকাশ।

শমীক সরকার : কমিউনাল ভায়োলেন্সের কথা যদি ভাবা যায়, তখন তো কমিউনিটিই ছিল, তার মধ্যেও তো ভায়োলেন্স ছিল।

কাজল মুখার্জি : এমনকী মহাত্মা গান্ধী যে গ্রামস্বরাজের কথা বলছেন, আম্বেদকর জিজ্ঞাসা করেছেন, গ্রাম কি একটা? যে কোন গ্রামে গেলেই ...।

সৌরীন ভট্টাচার্য : তিনি সম্পর্কের কথা বলছেন। ইনক্লুসিভের কোন মডেল কিন্তু আমাদের নেই। আমাদের আধুনিক জীবনের মডেলটাই বর্জন করতে বলছেন। তাই যদি মোড় ঘোরাতে হয়, তাহলে সব কিছুতেই বর্জনের বদলে গ্রহণ এবং আমার চিন্তা — কথাটা খুবই ধাক্কা লাগার মতো — এফিসিয়েন্সির ধারণাটাই প্রথমে বর্জন কর। যেমন, ক্লাসে ভালো ছাত্র খারাপ ছাত্র, তফাত করাটাই ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্স। বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত গল্প রয়েছে। ওঁকে একটা স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যা যা করার তিনি করেছেন। করার পরে বলছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছেলে কে আছ? হাত তোলো, আমি তাকে একটা পুরস্কার দেব। এটা থেকে তো আমাদের শিক্ষা নেওয়ার আছে। আমি যদি সবচেয়ে ভালো ছাত্রেরই খোঁজ করি, আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টগুলো কী পরিমাণ ভায়োলেন্ট। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টিতে ইংরেজি বিভাগে ধরা যাক আড়াই হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে, সিট হচ্ছে হয়তো ষাট। তাহলে আপনি কতজনকে এক্সক্লুড করলেন? এবার আমরা যদি পাল্টা চিন্তা করি, কারও ইংরেজি পড়ার ইচ্ছা হয়েছে, এটার জন্যই সে ইংরেজি পড়বে। তার ইংরেজি পড়ার যোগ্যতা আছে বলে নয়। বস্তুত যোগ্যতা নেই বলেই তো সে ইংরেজি মাস্টারমশাইদের কাছে আসছে পড়বে বলে। আজকে যদি কেউ এখানে এসে বলে, আমি এই আলোচনায় যোগ দিতে চাই। আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানাব। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বের করে দেবে।

মিত্রা চ্যাটার্জি : আপনি এখানেও তাকে বের করে দেবেন, যখন দেখবেন স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

সৌরীন ভট্টাচার্য : না, আমরা বাইরে যাব। আমরা কিছুতেই মাঠে নামবার কথা ভাবছি না। বিশ্বভারতীতে কিন্তু মাঠে নামবার কথা বলা হয়েছিল। আমরা সিরিয়াসলি নিইনি। ফেইলিওরটা আমরা বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, উনি নাচগান দিয়ে শেখাতে চেয়েছেন। ফেইলিওরটা কিন্তু আমাদের। অ্যাডমিশন টেস্ট নেওয়ার কোনও দরকার নেই। প্রশ্ন উঠবে, ক্লাসে জায়গা হবে না। উত্তর হল, আমরা দেওয়াল তুলে এইভাবে সাজিয়েছি বলে, আমাদের মাঠ আছে। প্রশ্ন উঠবে, বর্ষাকালে কী হবে? উত্তর, বর্ষাকালে বৃষ্টি এলে সেদিন ক্লাস হবে না। সেদিন সবাই বৃষ্টি দেখবে, কেউ কেউ হয়তো ভিজবেও। টেস্ট ম্যাচ থাকলেও তো ক্লাস হয় না। কোনও অসুবিধা নেই। আসলে আমরা ওই রাজপথ থেকে বেরোতে পারছি না।

জিতেন নন্দী : তাহলে এখন প্রশ্ন আসবে, এই যে ইডিওলজি, অর্গানাইজড অ্যাক্টিভিটি ইত্যাদির তো মানবসমাজে এখনও একটা মূল্য রয়েছে, ছোটোখাটো সুন্দরবনের একটা ত্রাণ তুলতে বা বিতরণ করতে গেলেও একটা সংগঠন লাগে —

সৌরীন ভট্টাচার্য : না, গ্রুপ অর্গানাইজেশন আর রিলিফ অর্গানাইজেশনের মধ্যে তফাত আছে। আমি পাড়ায় ত্রাণ তুলতে একটা কিছু করলাম আর একটা পার্টি ত্রাণ তুলছে — যেমন রামকৃষ্ণ মিশন খুব এফিসিয়েন্টলি ত্রাণ তুলছে, কিন্তু ওই সংগঠনের মধ্যে আমাদের এতক্ষণ যে আলোচনা হল তার এ টু জেড সমস্ত সমস্যাই রয়েছে। বড়ো সংগঠিত কাজের মধ্যে যা যা থাকে — হায়ারার্কি, ভায়োলেন্স, অবিচার, পাওয়ার গেম — রামকৃষ্ণ মিশনেও কোনও রাজনৈতিক দলের থেকে বোধহয় কম নেই। আমি অবশ্য কথাটা বলছি বাইরে থেকে, কোনও ভুল হলে শুধরে নিতে হবে।

জিতেন নন্দী : আর একটা কথা রয়েছে, অর্গানাইজড নন-ভায়োলেন্স।

সৌরীন ভট্টাচার্য : অর্গানাইজড কথাটায় আমার একটা ব্যক্তিগত অসুবিধা — অর্গানাইজ করলেই কিন্তু সেই সমস্যা আসবে। মারা যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে নরেশ গুহ সাহিত্য একাডেমির আমন্ত্রণে কবিতা পাঠ করেছিলেন। তাতে ওঁর একটা কবিতা ছিল — "ভয় পাই শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়"। পিস মুভমেন্টও যদি ওরকম ভঙ্গিতে বলে — শান্তি দেবে না মানে!

আমরাই মন্থনে আলোচনা করেছিলাম ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে, একদিক থেকে দেখলে তা টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি, আবার অন্যদিক থেকে সেটাই স্বাধীনতা সংগ্রাম হতে পারে। আমাদের ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কেও ...

গৌতম গাঙ্গুলি : আমরা বাইরে থেকে যাই বলি, এটা তো ওদের কাছে যাবে না, যদি ওরা ভেতর থেকে অর্গানাইজড না হয় অন্যভাবে। এক্ষেত্রে আমরা কী করব?

সৌরীন ভট্টাচার্য : না, না, আপনি কী করবেন? আপনার হাতে জগতের ভার নেই। ওটাই তো মানুষের গোলমাল হয়েছে। বিশ্বভুবনের ভার আমাদের কারোর হাতে তো দেওয়া নেই। বিশ্বভুবনের ভার নিতে গেলেই তো ইনজাস্টিস আসবে। সেই জায়গায় কেউ কেউ মুক্তি ইত্যাদি স্পিরিচুয়ালিজমের দিকে চলে যাচ্ছে। স্পিরিচুয়াল মুক্তির টার্ম্‌সে যদি নাও ভাবি, রিফর্মের যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষাদীক্ষার কথা বলা হচ্ছে, সে তো এই রিফর্মেরই জন্য। আমরা যদি একটু লেস ভায়োলেন্ট হই, আমি কখনও কারোর ওপরে কিছু চাপাচ্ছি কিনা, চাপাই যখন হয়তো অনেক সময় মঙ্গল চিন্তাতেই চাপাচ্ছি।

শমীক সরকার : আচ্ছা ধরা যাক, আপনি বাবা, আপনার মেয়ে মডেল হতে চায়। আপনার যদি মডেল সম্পর্কে তীব্র আপত্তি থাকে — অর্থাৎ যেভাবে সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, একজন ব্যক্তি সেখানে কী করবে?

সৌরীন ভট্টাচার্য : আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে আমার বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কিন্তু আমি এটা কখনোই সুপারিশ করব না, আমি অপছন্দ করি বলে তুমি মডেল হওয়ার কথা একেবারেই ভেবো না। অথবা যদি তুমি এরকম ভাবো, তাহলে এ বাড়িতে আর তোমার স্থান নেই।

শমীক সরকার : যদি কেউ বলে সামাজিকভাবে যে বড়ো আকারে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে লড়াই করা উচিত।

সৌরীন ভট্টাচার্য : বুঝেছি, ন্যায়বিচার প্রয়োগ করে। যেমন, সমাজের একটা অংশ আছে, যেখানে এই ধারণা রয়েছে মডেলিং খুব খারাপ। আর একটা অংশ আছে যেখানে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা মডেলিংয়ে যেতে চাইছে। আমি যখন বাবা হিসেবে কথা বলব, সমস্তটা হিসেবে নিয়ে আমাকে দায়িত্বসম্পন্ন বাবা হিসেবে কথা বলতে হবে, তা না বললেই আমি হব কর্তৃত্ববাদী বাবা। কর্তৃত্ববাদী বাবা হল ভায়োলেন্সের একটি উৎস। দায়িত্বসম্পন্ন বাবা হল সংলাপের উৎস। রিজাউনুর রহমান ...

অনিন্দ্য দত্ত : কিছু না বলাটাও এক ধরনের অপরাধ। বন্ধু হওয়ার অধিকার তো আছে।

শমীক সরকার : সামাজিকভাবে বড়ো আকারে চাপিয়ে দেওয়ার সঙ্গে লড়াই করার প্রশ্ন যখন আসে, তখনই কিন্তু একটা সংগঠনের প্রশ্ন ওঠে।

সৌরীন ভট্টাচার্য : সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার সঙ্গে লড়াই করার কথাটা যেরকম আনক্রিটিকালি বলা হচ্ছে, একটা গোলমাল ওখানে হচ্ছে। আমি যখন বলছি মডেলিং একটা খারাপ ব্যাপার আর ও যখন মনে করছে মডেলিং একটা ভালো ব্যাপার, এদের মধ্যে একমাত্র নন-ভায়োলেন্ট পদ্ধতি কিন্তু ডায়ালগ। বাংলা সিনেমায় কমল মিত্র যে ব্যাপারটা একেবারে বিশ্বাস করতেন না।

মিত্রা চ্যাটার্জি : আপনি এখানে এটা করতে পারলেও গ্রামীণ সমাজে পারবেন না। সেখানে আপনি যদি মেয়ের সঙ্গে ডায়ালগে যেতে চান, তখন সমাজের অন্য লোকেরা আপনাকে একঘরে করবে।

শমীক সরকার : একটা হায়ারার্কি সমাজের মধ্যে আছে। সমাজের মধ্যে একজন কোনঠাসা মানুষ তো কোন কথা বলতে পারে না। তাকে কথা বলতে গেলেই চিৎকার করতে হয়, সেই চিৎকারটা স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে।

জিতেন নন্দী : সেটাও আর একটা ভায়োলেন্সের প্রকাশ।

মইফুজ আলি : মানুষের যৌন অনুভূতি —

সৌরীন ভট্টাচার্য : সেটা ভায়োলেন্স হতে পারে। নাও হতে পারে। কোন অনুভূতির ভায়োলেন্স হতে পারে। যেমন অনিন্দ্য দত্ত বললেন, মানুষ দু'হাত খালি করে মাথা তুলে দাঁড়ালো, শিরদাঁড়া সোজা হল, ব্রেনের ওজন বাড়ল, ওটাই ভায়োলেন্স হতেই হবে অনিবার্যভাবে তা নয়, পজিশনটা ভায়োলেন্ট।

মইফুজ আলি : বোঝানোর তো একটা লজিক থাকবে —

সৌরীন ভট্টাচার্য : লজিক বলতে যদি বোঝানো, জ্ঞান, আলোচনা হিসেবে ধরা হয়, সে কিন্তু সবটার একটা বিশেষ মানে করে নেবে। নিজের মেয়েকে কেন তার বাবা অনেক কথা নিঃশব্দে বোঝাতে পারবে না। মেয়েও হয়তো অনেকখানি এগিয়ে আসবে। সেটাই তো নন-ভায়োলেন্ট সমাজের গুরুত্ব। এখানেই আসছে সম্পর্কের কথা, আমাদের সম্পর্কগুলো ভেঙে যাচ্ছে বলেই তো সমস্যা।

শমীক সরকার : মাওবাদীরা যে যুক্তিটা দেয়, সমাজের নিচুতলায় — হায়ারার্কির জন্যই — কথা বলতে গেলেই প্রকাশভঙ্গিটা ভায়োলেন্ট হয়। সেই কারণেই ভায়োলেন্সটা জাস্টিফায়েড হয়।

সৌরীন ভট্টাচার্য : খানিকটা ঠিক। ওই যে সমাজের একদম নিচুতলা, যার ওপর সমস্ত হায়ারার্কির চাপটা পড়ছে, যাদের কন্ঠস্বর রুদ্ধ, তুমি যদি নিজের ওপর দায়িত্ব নাও — তুমি ব্যক্তি বা সংগঠন — তুমি অবশ্যই কষ্ট পাবে, কিন্তু ইমিডিয়েট তোমার কিছু করার নেই।

জিতেন নন্দী : নন্দীগ্রাম বা লালগড় সর্বত্রই দেখা গেছে, সাধারণ মানুষ কোন বিশেষ সময়ে একটা গণআন্দোলনে শামিল হল, কিন্তু সেটা অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। এবার কোনও না কোনও দল এসে সেটা দখল করবে। যেমন, এখানে সিপিএম দখল করে নেবে বলে একটা টেনশন। এটাই মাওবাদী ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে এসেছে।

শমীক সরকার : মাওবাদীরাও মানুষ। তারাও আমাদের মতো ভাবছে। কিন্তু যখন এই টেনশনটা আসছে, সিপিএম দখল করে নেবে —

জিতেন নন্দী : একটা পার্টি বরাবর শাসন করে এসেছে আদিবাসী অঞ্চলে। সিপিএম করেছে, তারপর ঝাড়খণ্ড পার্টি এল। ঝাড়খণ্ড পার্টি যখন নানান ফ্যাকশনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তখন মাওবাদীদের প্রবেশ ঘটছে সেই পরিসরটাতে। এখন নক্সালদের অন্যান্য ফ্যাকশন কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সেই অথরিটির জায়গায় নেই, মাওবাদীরা কিন্তু আছে।

সৌরীন ভট্টাচার্য : এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে সমস্ত কথাটাই হচ্ছে দখলের টার্ম্‌সে। আমরা যে দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত থেকে আজ আলোচনাটা শুরু করেছিলাম, সেখানে কিন্তু দখল ক্যাটেগরিটাকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে আমরা এগিয়েছি। ... পজিশনটা হবে দখলকেই অস্বীকার করা।

জিতেন নন্দী : সাধারণ মানুষের মধ্যে একদল কিন্তু মনে করছে, মাওবাদীরা যদি দখলটা নেয়, তাহলে সিপিএমের অত্যাচার থেকে বাঁচা যাবে।

সৌরীন ভট্টাচার্য : সেখানে এই অংশটাকে তোমার বলতে হবে, এইটা তোমার সাময়িক চিন্তা।

জিতেন নন্দী : তাহলে সাধারণ মানুষের সেই সিপিএমের কর্তৃত্বে ফিরে যাওয়া — —

সৌরীন ভট্টাচার্য : এর সবটাই কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ভাবনাকে মুলতুবি রেখে ভাবা হচ্ছে। নন-ভায়োলেন্ট এজেন্সি কখনওই দখলের টার্ম্‌সে ভাববে না। আমরা নিজেদের পার্টটা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। লালগড়ে এই যে অনুন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, এর জন্য তো আমি-তুমি দায়ী। আমি-তুমি তো এতদিন নিজের কোলে ঝোল টেনে নিয়েছি। সব সময় একটা আশু ব্যাপার তো থাকেই। সমস্ত সময়েই আমরা ইমিডিয়েটের কথা ভেবে লঙ টার্মের প্রশ্নটাকে স্থগিত রেখেছি। ইতিমধ্যে বাজার তার কাজ করেছে। বাজার তার অধিকারবোধ দেখিয়ে গেছে বাজারের টার্ম্‌সে। আজকে শপিং মল এসেছে, সেটা দেখতে বেশি ভায়োলেন্ট লাগছে। কাজেই লঙ টার্ম ভুলে যদি ইমিডিয়েট ভাবো, একটা বড়ো গোলমাল। এইজন্যই বারবার রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর কাছে যাওয়ার কথা উঠছে। 'হিন্দস্বরাজ'-এ গান্ধীর কাছে ইংরেজ শাসনের অবসান দরকার ছিল, কারণ এই নয় যে তা ভারতীয় সমাজের পক্ষে অহিতকর, তা ইংরেজ সমাজের পক্ষেই অহিতকর।

জিনগত মারণযজ্ঞ ... ১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

লেখা আছে সেগুলো এই সত্যের জীবন্ত সাক্ষ্য যে প্রকৃতির মধ্যেই প্রাচুর্য্য নিহিত। কীভাবে তাকে আমরা আয়ত্ত্ব করব সেটাই শিখতে হবে।

পুনশ্চ

জৈব তথা জিনগত সম্পদের এক বিশাল ভাঁড়ার এই ভারতবর্ষ। এটাই দেশের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তার ভিত্তি। শস্যর উন্নয়ন ও প্রাচুর্য্যের জন্য শস্য গাছগুলোর নিকটবর্তী আত্মীয় বুনোগাছ-গাছড়াগুলোকে রক্ষা করাই সবচেয়ে সুনিশ্চিত পন্থা যাতে স্বাস্থ্যকর বীজব্যবস্থা বজায় থাকে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যা কিনা জৈব-বৈচিত্র্যকে অবশ্যম্ভাবীভাবে খর্ব করে তার থেকে অনেক অনেক উন্নত পরিবর্ত ব্যবস্থা হল কৃষকদের হাতেই বীজ পছন্দ করার ও সংকর বীজ বপনের প্রয়াসকে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু ট্রান্সজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে কখনই তা করতে দেওয়া যায় না, কখনই নয়।

অনুবাদ অমিতাভ সেন

শিকার

ভগবতী পানিগ্রাহী

'শিকার' গল্পের লেখক ভগবতী চরণ পানিগ্রাহী (১৯০৮–১৯৪৩) বেঁচেছিলেন মাত্র চৌত্রিশ বছর। একজন সাহিত্যকার তথা বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ওড়িয়া যুবসমাজে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল যেন এক উল্কার মতো। তিনি ছিলেন উড়িষ্যায় কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় ওই দলে ওড়িয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কৃষক' প্রকাশিত হয়। তখন কংগ্রেসের মধ্যেই তাঁরা কাজ করতেন। ১৯৩৫ সালে তিনি প্রগতিবাদী ওড়িয়া কবি–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে 'নবযুগ সাহিত্য সংসদ' গঠন করেন। এই মঞ্চ থেকেই আঠাশ বছরের যুবক ভগবতীর সম্পাদনায় কটক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল মার্ক্সবাদী মাসিক পত্রিকা 'আধুনিক'। ১৯৩৬–এ তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে তৎকালীন আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন। মাত্র নয়–দশ বছরের কর্মজীবনে তিনি 'শিকার', 'হাতুড়ি ও দা', 'জংলি', 'ঝড়' ইত্যাদি গল্পও লিখেছিলেন।

'সাহিত্য একাডেমি' ভগবতী পানিগ্রাহীর জন্মশতবর্ষে দু'দিন ব্যাপী আলাপ–আলোচনার আয়োজন করেছিল কলকাতায়। আমন্ত্রিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শ্রী মনোরঞ্জন মহান্তি তাঁর সমাপ্তি ভাষণে ভগবতী পানিগ্রাহীর 'শিকার' গল্প এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর 'হিন্দস্বরাজ' নামক সংলাপের প্রসঙ্গ টেনে এক সুন্দর আলোচনা করেন। বিষয় ছিল আজকের ভারতীয় সামাজিক পটভূমিতে হিংসা–অহিংসা তর্ক। প্রসঙ্গত এটা 'হিন্দস্বরাজ'–এরও শতবর্ষ।

আমরাও প্রাসঙ্গিকতার বিচারে 'শিকার' গল্পটির একটি বঙ্গানুবাদ পুনর্মুদ্রণ করছি। অসিত সরকার, কমলেশ সেন ও সিদ্ধার্থ ঘোষের সম্পাদনায় 'সাহিত্যধারা' প্রকাশিত 'প্রতিবেশী সূর্যের রক্তাক্ত দিনগুলি' (নভেম্বর ১৯৭২) নামক সংকলন–গ্রন্থ থেকে কুমার কর–এর অনুবাদ করা 'শিকার' গল্পটি এখানে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সত্তরের দশকেই শ্রী মৃণাল সেনের পরিচালনায় এই গল্পটি 'মৃগয়া' নামক ছায়াছবির রূপ পেয়েছিল।

ওই এলাকার ঘিনুয়া বেশ নাম করেছে শিকারী হিসেবে। ঘিনুয়া বন্দুক চালাতে শেখেনি। তার প্রধান অস্ত্র হল নিজের তৈরি ধনুক আর তীর। তীর ছোঁড়ার সময় সে প্রায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। বাঁ–পাটা ধনুকের সঙ্গে লাগিয়ে কানের কাছ পর্যন্ত তীরটা টেনে এনে ছুঁড়ে দেয়। এ ভাবে এক মাইল দূর থেকেও সে তীর মেরে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। এই ধনুকের সাহায্যেই সে মেরেছে অসংখ্য হরিণ, সম্বর, শুয়োর আর ভালুক। চিতাবাঘও মেরেছে অনেক, তবে বড়ো বাঘ মেরেছে মাত্র দু'টো। বাঘ দুটো মেরে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে সে বেশ কিছু বকশিসও পেয়েছিল।

সেদিন সকাল বেলা ঘিনুয়া অদ্ভুত একটা শিকার নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে এসে হাজির হল। তার এক কাঁধে ঝোলানো রয়েছে গোটা দুই তিন তীর, অন্য কাঁধে পড়ে আছে একখানা কুঠার। এ হেন বেশে ঘিনুয়াকে দেখে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের চাপরাশি জিগেস করল, 'কিরে, কি শিকার এনেছিস আজ?'

ঘিনুয়াকে সে বেশ ভালো করেই চেনে। অনেকবার সে তার বকশিসের অংশীদার হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঘিনুয়া তার দুপাটি ময়লা দাঁত বের করে দেখাল। সে হাসল না খেঁকিয়ে উঠল ঠিক বোঝা গেল না। কেননা সত্যিকারের হাসি যাকে বলে সে হাসি ঘিনুয়ার মুখে কেউ কোন দিন দেখেনি। তাই চাপরাশি আবার জিগেস করল, 'কিরে আজ কী শিকার করে এনেছিস?'

গামছায় বাঁধা একটা পুঁটলি নির্দেশ করে ঘিনুয়া বলল, আজ সে একটা মস্ত বড়ো জানোয়ার শিকার করে এনেছে।

চাপরাশি প্রশ্ন করল, 'বাঘ?'

মাথা নেড়ে ঘিনুয়া জানাল, না।

'তবে কি চিতাবাঘ, ভালুক না শুয়োর?'

ঘিনুয়া মাথা নাড়ল।

'তাহলে কী এনেছিস রে?'

গোলমাল শুনে খোদ সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘিনুয়া একটা সেলাম করে সাহেবের দিকে তেমনি দাঁত বের করে চেয়ে রইল। সাহেবও শিকারের চেহারাটি দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করাতে গামছা খুলে ঘিনুয়া বার করল একটা সদ্য–কাটা মানুষের মাথা এবং মাথাটা ও নামিয়ে রাখল তাঁর পায়ের কাছে।

চমকে উঠে সাহেব পিছিয়ে গেলেন দু'পা। আর ঘিনুয়া হাত বাড়িয়ে বলল, 'সাহেব বকশিস?'

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সাহেব ইঙ্গিতে ঘিনুয়াকে বকশিসের জন্যে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেলেন, তারপর ফোন করলেন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে। এ ছাড়া ঘিনুয়াকে শায়েস্তা করার আর কোন উপায় ছিল না। একে তার গায়ে অসুরের বল, তার ওপর হাতে আছে তীর ধনুক আর কুঠার।

হাতে পায়ে বেড়ি নিয়ে ঘিনুয়া যখন হাজতে ঢুকল তখনও ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। এ ভাবে আটকে রাখার কারণ কী? সুযোগ পেলেই একে তাকে জিগেস করে ঘিনুয়া। কেউ বলে তার ফাঁসি হবে, কেউ বলে কালাপানি পেরিয়ে তাকে যেতে হবে দ্বীপান্তরে। কেন, এমন কী অপরাধ সে করেছে? কিছু বুঝে উঠতে পারে না ঘিনুয়া। ওদের কথাকে সে বিশ্বাস করে না। শেষে একদিন ডেপুটি কমিশনার এলেন জেল পরিদর্শনে। ঘিনুয়া তাঁর কাছ থেকে সবকিছু জানতে চাইল। সাহেব বললেন, এতকাল সে বাঘ ভাল্লুক মারতো, তাই বকশিস পেত সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এবার সে মেরেছে একটা মানুষ, তাই কী বকশিস দেওয়া হবে সেটা পাঁচ জনের ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে।

কথাটা ঘিনুয়ার মনে ধরল। যেদিন ঘিনুয়ার বিচার হল সেদিন সে মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই তার ভালো বকশিস জুটবে। সুতরাং উৎসাহিত হয়ে জজের কাছে সব খুলে বলতে লাগল : গোবিন্দ সর্দারের মাথা কাটতে গিয়ে তাকে কম কষ্ট করতে হয়নি। অনেকে ওকে মেরে ফেলবার জন্যে সুযোগ খুঁজলেও কেউ পারেনি। গোবিন্দ সর্দার যে সব সময় মোটর চড়ে ঘুরে বেড়ায়। নিজের অঢেল সম্পত্তি করেছে সকলের লুটপাট করে। ওটা কি কম শয়তান ছিল? কত লোককে খুন করেছে, কত লোককে যে উচ্ছেদ করেছে আর কত মেয়েমানুষের যে সতীত্ব নষ্ট করেছে তার কি কোন হিসেব আছে? এই ভাবে তো ঘিনুয়ার জমিবাড়ি কেড়ে নিয়ে সব কিছু লুটেপুটে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে ঘিনুয়ার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল। বেটার কী সাহস!

হঠাৎ ঘিনুয়াকে সামনে দেখে গাড়ি নিয়ে চম্পট দিচ্ছিল। বেটা ভেবেছিল ঘিনুয়ার হাত থেকে রেহাই পাবে। তা কি কখনও হয়। প্রথমে দূর থেকে চাকায় তীর মেরে গাড়িটাকে দিলাম অচল করে। তারপর কুঠারের এক কোপে তার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সেই রাত্রেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা ছুটতে লাগলাম। প্রায় ত্রিশ মাইল পথ ছুটে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে এসে পৌঁছলাম।

গোবিন্দ সর্দার যে সে লোক নয়। হাতে তার সব সময় থাকত বন্দুক। লোকে বাঘ ভালুকের চেয়ে ওকে বেশি ভয় করত। কেননা বাঘ ভালুকের চেয়ে মানুষের সর্বনাশ ও অনেক বেশি করেছে। সুতরাং ওকে মেরে ঘিনুয়া কম সাহস আর বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়নি। কয়েক বছর আগে বিদ্রোহী নেতা ঝপট সিং-এর মাথা কাটার জন্যে ডোরাকে সাহেব পাঁচশো টাকা বকশিস দিয়েছিলেন। অথচ ঝপট সিং মানুষটা ভালো ছিল। সে কোন মেয়েমানুষের সতীত্ব নষ্ট করেনি। অথবা কারও জমি বাড়িও দখল নেয়নি। সে খাজাঞ্চি খানা লুঠ করেছিল আর একবার মেরে ফেলেছিল একটা সিপাইকে। কিন্তু গোবিন্দ সর্দার একটা ভয়ঙ্কর লোক। তাকে মারার জন্যে ঘিনুয়াকে অনেক বেশি বকশিস দেওয়া উচিত।

ঘিনুয়ার যুক্তি শুনে সকলে হেসে উঠলেন হো হো করে। জজ সাহেব বললেন : হ্যাঁ তা ঠিক, ন্যায্য পাওনা তোকে দিতে হবে বইকি। সরকারি উকিল বললেন : তোকে বকশিস দেবার জন্যেই তো এখানে আনা হয়েছে। কথাগুলোকে ঘিনুয়া পরিহাস না ভেবে সহজ অর্থে গ্রহণ করল, কেননা ঠাট্টা পরিহাস সে বোঝে না।

সুতরাং প্রাণদণ্ডের রায় দেবার পরেও ঘিনুয়া তার যথার্থ অর্থ কিছু বুঝতে পারল না। তাছাড়া জেলে নিয়ে যাবার পথে বোঝানো হল তার বকশিস পাবার দিন এগিয়ে আসছে। সুতরাং ঘিনুয়া তখনও বুঝতে পারল না যে সে একজন অপরাধী এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ঝপট সিংকে মারা আর গোবিন্দ সর্দারকে মারা যে এক ব্যাপার নয় — একথা সে কেমন করে বুঝবে। সে জানতে পারল না যে একটা হল গৌরবের বিষয় আর অন্যটা অপরাধ। বুনো সাঁওতাল হতভাগা ঘিনুয়ার মোটা মাথায় আইনের এতসব সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ ঢুকবে কেমন করে?

মনে মনে ঘিনুয়া ভাবে ঝপট সিংকে মেরে ডোরা পেয়েছিল পাঁচশো টাকা। তার চেয়ে বেশি না হলে ও নেবে কেন? সবটাই ফিরিয়ে বলবে, কিছু না দিলেও চলবে সাহেব, কিন্তু ডোরার চেয়ে আমাকে বকশিস বেশি দিতে হবে।

নির্জন সেলে একাকী ঘিনুয়া গভীর অন্ধকারে বসে অনেক কথা ভাবে। কথা বলার একটা মানুষও সে দেখতে পায় না। কথা বলার ইচ্ছাও তার নেই। শুধু বকশিস নিয়ে ঘরে ফেরবার জন্যে তার মন ছটফট করতে থাকে।

অবশেষে ফাঁসির দিন এসে গেল। জিজ্ঞাসা করা হল সে কী চায়? ঘিনুয়ার এক কথা : আমার বকশিস? তখনও তাকে বলা হল : চল্ তোকে বকশিস দেওয়া হবে। তার মাথায় পরানো হল কালো কাপড়। ঘিনুয়া ভাবল বোধ হয় চোখ বেঁধে তার হাতে ঢেলে দেওয়া হবে অনেক সোনা-রূপো। সরকারের লীলা বোঝাই ভার। এমনি করে কি শুধু শুধু বকশিস দেওয়া যায়? ঘরে ফিরে বউকে সে সব কিছু দেখাবে, বউ নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। এই টাকায় সে নতুন ঘর তৈরি করবে, জমি-জায়গা কিনবে — কত সুখ! এখন তো আর গোবিন্দ সর্দার নেই যে সব কিছু লুঠ করে নেবে।

হঠাৎ কী একটা এসে তার গলায় বেড়ি পাকিয়ে গেল।

হিংসা বিষয়ে ঘিনুয়া-সাঁওতাল উপস্থাপনা

মনোরঞ্জন মহান্তি

আজ বিপ্লবী কর্মী ভগবতী পানিগ্রাহী (১৯০৮-১৯৪৩)-র জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপনের ক্ষণে ভারতবর্ষ জুড়ে হিংসার ঘটনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ধর্মান্ধদের সন্ত্রাসবাদী হিংসা, আদিবাসীদের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকে শুরু করে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সামরিক অভিযান পর্যন্ত এই হিংসার ঘটনাবলী বিস্তৃত। জনআন্দোলনগুলির হিংসার পথ নেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে তর্ক আজ আবার নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, বিশেষত মাওবাদীদের প্রভাব মধ্য ও পূর্ব ভারতে প্রসারিত হওয়ার ফলে। ভগবতী পানিগ্রাহীর অমর কাহিনী 'শিকার' এই তর্কে হয়তো এক কার্যকর সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে। সাঁওতাল আদিবাসী ঘিনুয়ার গল্পে আমরা জানতে পারি কীভাবে সে একেবারে শেষ উপায় হিসেবে পলায়মান জমিদার গোবিন্দ সর্দারকে হত্যা করতে বাধ্য হয়।

বহু-চর্চিত এই গল্পের বিশ্লেষণ এতদিন এক 'নির্দোষ' আদিবাসীকে উপস্থাপিত করে এসেছে, যে গোবিন্দ সর্দারকে আর একটি হিংস্র বাঘ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তাই সেই জমিদারকে মেরে ফেলার পর সে তার মুণ্ডুটা নিয়ে এল এই আশায় যে ডেপুটি কমিশনার সাহেব স্বাভাবিকভাবেই তাকে পুরস্কৃত করবেন, কারণ সে আরও শক্তিশালী একটি জানোয়ার শিকার করেছে। ভগবতীর বিচারের বর্ণনা এই নির্দোষ-উপস্থাপনাকে আরও পুষ্ট করে তোলে, কেননা একদম ফাঁসির মুহূর্ত পর্যন্ত ঘিনুয়া তার কাজের ইনাম স্বরূপ সোনা-রুপো আশা করছিল।

আমি এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে চাই। আমি বলতে চাই যে, ঘিনুয়ার কাজটা ছিল যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত এবং এই গল্পটা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অধীনে বিদ্যমান শ্রেণী, জাত ও লিঙ্গগত শোষণের এক শক্তিশালী চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। শিকার গল্পে হিংসার প্রশ্নে তিনটি উপাদান নিহিত রয়েছে। একটি উপাদান — যা আদিবাসী এলাকাগুলিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও জমিদারদের দ্বারা সাধিত হয়েছে এবং গল্পে বিস্তারিতভাবে যার উল্লেখ রয়েছে — কাঠামোগত হিংসার সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছে। সেই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ঝপট সিংকে ডোরা হত্যা করে এবং ব্রিটিশ রাজের কাছে সে পুরস্কৃত হয়। তৃতীয় উপাদানটি হল হিংসার একটি সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, যাকে নানান কিছু সমেত আদালতের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেওয়া হয়, সেটাও বেশ ভালোভাবেই এই গল্পে এসেছে।

প্রথমত, কেন জমিদার গোবিন্দ সর্দার একটি বাঘের চাইতেও ভয়ানক, তার বর্ণনা দেয় ঘিনুয়া। ঘিনুয়া সহ বহু লোকের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে এই সর্দার, তাদের জীবিকার উৎস থেকে বঞ্চিত করেছে। "সকলকে লুঠ করে বহু সম্পদ জড়ো করেছে সে, তাই সে এক বড়ো শয়তান। বহু মানুষকে সে হত্যা করেছে, বহু পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে, বহুজনকে অপমান ও হয়রান করেছে, বহু মহিলাকে ধর্ষণ করেছে।" এইভাবে ঘিনুয়া নিজের কাছে গোবিন্দ সর্দারকে আক্রমণ করার যুক্তি খুঁজে নিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ছত্রছায়াতেই যে গোবিন্দ তার স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যাচ্ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে গেল যখন খোদ ডেপুটি কমিশনার টেলিফোন করলেন এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বন্দোবস্ত করলেন। ঘিনুয়াকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে, পা দুটো বেঁধে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। আদালতের বিচারে আর একটি জিনিস প্রমাণ হল, কীভাবে রাষ্ট্র তার দমনপীড়নের হিংস্র কাঠামোকে বহাল রাখে। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনাও সমানভাবে স্পষ্ট হল যে, আদিবাসী সমাজ সেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল যারা জঙ্গলের

সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল এবং সেই সম্পদের ওপর নিজেদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য কায়েম করেছিল। বিদ্রোহী (মেলিয়া) ঝপট সিং এসেছে জমিদার গোবিন্দ সর্দারের একেবারে বিপরীত এক চরিত্র হিসেবে। ব্রিটিশ সরকার সেই বিদ্রোহীর 'মাথার ওপর' ইনাম ঘোষণা করেছিল। ডোরা নামক হত্যাকারী ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। ঘিনুয়া প্রশ্ন করেছিল, ঝপট সিংকে কেন মেরে ফেলা হল? "সে কোন মেয়েমানুষের সতীত্ব নষ্ট করেনি। অথবা কারও জমি বাড়িও দখল নেয়নি। সে খাজাঞ্চি খানা লুঠ করেছিল আর একবার মেরে ফেলেছিল একটা সিপাইকে।" এই ছিল আদালতের কাছে ঘিনুয়ার নিজের বয়ান। সেখানে সে বাড়তি ইনাম দাবি করেছিল, কেননা সে 'এক বড়ো ভয়ঙ্কর লোক'-কে শেষ করে দিয়েছে।

এইভাবে ভগবতী সযত্নে ফুটিয়ে তোলেন, কীভাবে সরকারি কোষাগারের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ সহ গণবিদ্রোহগুলি এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ঘিনুয়ার ঘটনাটি ছিল সেই গণবিদ্রোহেরই অংশ। এই ঘটনার আগে বহুবার লোকে গোবিন্দ সর্দারকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। সর্দার সর্বদা সঙ্গে একটা রাইফেল রাখত। এছাড়া সঙ্গে থাকত সশস্ত্র রক্ষী। সে একটা জিপে চড়ে ঘুরে বেড়াত এবং সবসময় দ্রুত পালিয়ে যেত। ভাগ্যক্রমে সেইদিন সে ছিল ঘিনুয়ারই ঘরে। সেখানে সে ঘিনুয়ার বৌকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। মার্ক্সবাদী লেখক ভগবতী মানবতার ওপর পুঞ্জিভূত আগ্রাসনের সেই মুহূর্তে শ্রেণী, লিঙ্গ ও জাতিগত শোষণের গভীর চিত্রটিকে সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাই যখন বিখ্যাত বাঘ শিকারী ঘিনুয়াকে তীর-ধনুক সমেত উৎপীড়ক গোবিন্দ দেখতে পেল, সে দ্রুত গাড়িতে চেপে চম্পট দিল। ঘিনুয়া একটি তীর ছুঁড়ে তার গাড়ির চাকা ফুটো করে দিতে চাইল, আর একটি তীর দিয়ে সে উৎপীড়কটার গলাটাই কেটে ফেলতে চাইল। সে ছুটে জিপের কাছে পৌঁছাল এবং হাতের কুড়ুলের এক আঘাতে শিকারের গলাটাই উড়িয়ে দিল।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র কীভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করল? এক সাংঘাতিক খুনে। এই বিচার রাষ্ট্রের চরিত্রটাকে উন্মোচিত করল এমন এক দমনমূলক সংগঠন হিসেবে যা সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক জাতিগত দমনপীড়ণের ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করে।

এটা কি 'ব্যক্তি সন্ত্রাস' বা দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ডের একটি ঘটনা ছিল? অতএব 'বিপ্লবী হিংসা'-র দৃষ্টান্ত ছিল না? ভগবতীর গল্পকে একদিকে নির্দোষ আদিবাসী এক বিবৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; অন্যদিকে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ব্যক্তি সন্ত্রাস' হিসেবে। সম্ভবত গল্পটির এই দুই মতের থেকে আলাদা এক বৃহত্তর সম্ভাবনা রয়েছে।

জনআন্দোলনে হিংসার স্থান সম্পর্কে ঘিনুয়া-সাঁওতাল উপস্থাপনা হিংসাকে দমনপীড়নের কাঠামোর বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে তুলে ধরেছে। কিন্তু সেটা একটা শেষ উপায় এবং মোটেই সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে হিংসার কথা বলে না। এই হিংসা তাদের দ্বারাই প্রযুক্ত হয়, যারা ঘিনুয়া-সাঁওতালের মতোই প্রকৃতি ও মানবপ্রেমিক এবং যারা ন্যায়ের জন্য লড়াই করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

অনুবাদ জিতেন নন্দী

হিংসা প্রসঙ্গে এক অহিংসাপন্থীর ভাবনা

১২ আগস্ট ২০০৯ পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে আদিবাসীদের এক বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার পথে কলকাতায় হিংসা-অহিংসা প্রসঙ্গে শ্রীমতী মেধা পাটকর (মে. পা.)-এর সাক্ষাৎকার নেন মন্থন সাময়িকীর কর্মীরা। পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করেন মূলত জিতান নন্দী (জি. ন.)। সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি বাংলায় প্রকাশ করা হল।

জি.ন. : আপনি অনেকবার বলেছেন, আপনি অহিংসার পক্ষে। কিন্তু আজকের দিনে অহিংসার অর্থ কী? কেমন করে একজন অহিংসার পথ ধরে চলতে পারে? পৃথিবী তো এখন হিংসাময় হয়ে গেছে। আমার প্রথম প্রশ্ন, একটা বর্গ হিসেবে হিংসাকে আপনি কীভাবে দেখেন? বাস্তব রাজনীতির প্রশ্নে পরে আসা যাবে।

মে.পা. : হিংসা কোনও মানবিক ব্যাপার নয়, অমানবিক। যে মানবতার কথা আমরা বলি, মানবিক মূল্য বা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেখানে হিংসার স্থান থাকা উচিত নয়। কারণ, শুধু মানুষের ওপর ওই হিংসা হচ্ছে, এমন নয়। সমস্ত জীবিত প্রাণীর ওপর হিংসার প্রশ্ন রয়েছে। জিনিসপত্র ভাঙচুরকে হিংসা বলে না। তাই কোনভাবে কোন মানুষের গায়ে হাত তোলা, তার শরীর বা মনকে ... মানসিক হিংসাও হতে পারে ... অত্যাচার করা, সেটাই হিংসা। এটার বিভিন্ন স্তর আছে। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনেও হিংসা আছে। আমার মতে সব ধরনের হিংসাকে বিরোধিতা করা দরকার। তবেই কোন মানবিক মূল্যবোধের একটা চৌহদ্দি তৈরি হতে পারে। যেখানে আত্মসম্মান, শ্রদ্ধা এবং ব্যক্তিত্বকে মেনে চলার প্রশ্ন রয়েছে, যেখানে কারো অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হবে না, সেখানে অহিংসাকে কেবল একটা স্ট্র্যাটেজি হিসেবে নেওয়া উচিত নয়। তাকে একটা মূল্যবোধ হিসেবে নেওয়া উচিত। হিংসা মানবিক মূল্যবোধের বিরোধী। সেইজন্য পার্টিকেও আমি মানি না। কারণ হিংসা দিয়ে হিংসা মরে না। হিংসা দিয়ে হিংসাকে তাড়ানোর চিন্তা একটা বিকৃত চিন্তা। আপনি হিংসা দূর করতে চান, সেটা যদি সরকারের হিংসাও হয়, আর তাই আপনি হিংসার পথ নিচ্ছেন — এই যুক্তি আমার মাথায় ঢোকে না। রাষ্ট্র হিংসা করবে, এটা তো কখনই মানা যায় না। কারণ রাষ্ট্রের ওপর এক বড়ো দায়িত্ব আছে, তা সবার প্রতিনিধিত্ব করে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের একটা মঞ্চ সেটা। তাই এটা আমি কিছুতেই মানতে পারি না।

আপনি দেখবেন বুদ্ধ, কবীর ... যাঁরাই একটা মানবিক জীবনদর্শনের কথা বলেছেন, জীবনযাপনের এক ইতিবাচক পথ দেখিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই হিংসার বিরোধিতা করেছেন। অন্তিম লক্ষ্যের দৃষ্টি এবং [এখনকার] রাস্তার দৃষ্টি – দুটোই থাকতে হবে। ধরুন আমার অন্তিম লক্ষ্য শান্তি, তাই আমি [এখন] অশান্তি চাই — এটা হয় না। আমি সব কিছু থেকে মুক্ত হতে চাই, তাই আমি মদ খাই!

জি.ন. : আমরা তো খুব বেশি আজকের পরিস্থিতি নিয়েই চিন্তা করি। দিন দশেক আগে আমাদের স্বরাষ্ট্রসচিবকে যখন মিডিয়া দলীয় সন্ত্রাস নিয়ে প্রশ্ন করছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, কোন দল আগ্রাসী নয়? আর কোন দল তার শিকার নয়? এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন — এই যে ক্ষমতার রাজনীতি — সংসদীয় বা অসংসদীয়, সমস্ত জায়গায় ক্ষমতার রাজনীতি আছে। কেন্দ্রীভূত (centralized) ওইসব দলের ভেতরে বিনা হিংসায় কি কিছু হতে পারে?

মে.পা. : হতেও পারে আবার নাও পারে। কল্পিতভাবে সব কিছুই হতে পারে। আজকের পরিস্থিতিতে রাজনীতির যে অপরাধীকরণ হয়েছে, তা পুরো ভুল। ওটার নিন্দা করা দরকার। হতে পারে আমরা যারা নিন্দা করছি, তারা সংখ্যালঘু। কিন্তু নিন্দা তো করা দরকার। আমি যদি ক্ষমতার পক্ষে হই, তাহলেও কি আমার জীবদ্দশায় ওই ক্ষমতা আসবে দেশে! তবুও আমি

ক্ষমতার জন্য লড়েই মরব! একই কথা হিংসা-অহিংসার পক্ষেও প্রযোজ্য। তবুও আমি হিংসার পক্ষেই থাকব! রাজনীতির যে অপরাধীকরণ হয়েছে, তা কারণ এবং ফল দুইই বটে। সমাজের অপরাধীকরণ এবং হিংসার বাড়বৃদ্ধিতে রাজনীতির অপরাধীকরণ গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে। আমি এটা বলছি না যে, রাজনীতির অপরাধীকরণের মূলে আছে সমাজ। ব্যাপারটা এত সোজা নয়। কিন্তু এই যে রাজনীতির অপরাধীকরণ গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে এতে সমাজের ভূমিকা আছে। এই যে সমাজের সইয়ে নেওয়া, যেমন দুর্নীতির ক্ষেত্রে, হিংসার ক্ষেত্রেও সমাজ একে মান্যতা দিচ্ছে। মানুষ অপরাধীদের ভোট দিচ্ছে, অপরাধীদের পেছনে চলছে। এরকম নয় যে মানুষ কেবল অহিংসাকেই মানছে। কিন্তু সমাজও কাল পিছলে যেতে পারে। যদি বাস্তব অবস্থা বদলায়, তাহলে তারও একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমি তার মূলে গিয়ে দেখতে পারি, কিন্তু সেটা তো মেনে চলতে পারি না। আমার মত এটাই। এখানেই তো একটা আলাদা ভূমিকা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।

আর দলীয় রাজনীতিই সব কিছু নয়। ওটা একদিকে বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু আজও তা সব কিছু নয়। তাই এই যে একটা ছবি খাড়া করা হচ্ছে যে, দলীয় রাজনীতিই সব কিছু করছে, সব কিছুর মূলে, পার্টি-রাজনীতিই সব, অথচ রাজনীতি তো আমরাও করি। কিন্তু এই যে ব্যবস্থার একটা রাজনীতি, আমি ভারতীয় প্রেক্ষিতে কথা বলছি, যাকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হয়, সেখানে বাজার আর পয়সাও জোরকদমে রয়েছে, অপরাধ আর গুন্ডামিও জোরকদমে রয়েছে। এই তো হল বাস্তবতা। এখন এটাকে কীভাবে আমরা ঝেড়ে ফেলব, কীভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করব, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমাদের এটাকে মেনে নিলে চলবে না। যেহেতু এটা জোরকদমে চলছে, তাই আমরা তার মধ্যে ভিড়ে যাব, এটাও আমার মনে হয় ভুল চিন্তা।

এই অ-দলীয় রাজনীতি এবং এই অ-নির্বাচনী রাজনীতিকে আরও বেশি করে কার্যকর করার কথা ভাবতে হবে। কারণ আমরা নির্বাচনী রাজনীতিতে এই দোষটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে এক সাচ্চা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা আসছে। আমরা এই নির্বাচনী রাজনীতিকে এই জন্য মানছি না বা প্রশ্ন করছি, কারণ তা সত্যি অর্থে গণতান্ত্রিক নয়, প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। তাই অ-নির্বাচনী রাজনৈতিক সংগঠনে আরও বেশি গণতন্ত্র আনা এবং সত্যি অর্থে একটা গণভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েই সেই রূপান্তর ঘটানো, এই দায়িত্ব আমাদের ওপর আরও বেশি করে বর্তায়। একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে। দলীয় রাজনীতিতে অপরাধীকরণ হয়েছে, আজকের দিনে সে হিংসা বিনা চলতেই পারে না। বিভিন্ন ধরনের হিংসা। পুলিশ বাহিনী মজুত রাখা এবং লেলিয়ে দেওয়া এক ধরনের হিংসা, আবার গুন্ডা পুষে ঠেঙানো আর এক ধরনের হিংসা। রাজনৈতিক দল যে বিভিন্ন প্রকারের হিংসা করছে, সেটাকে আমরা যারা নিন্দা করছি, তাদের আরও কড়াকড়িভাবে অহিংস পথ নিতে হবে। যারা মার্ক্স বা মাও-কে মানে, তাদেরও এটা বুঝতে হবে যে, গণভিত্তিক রূপান্তরের ভাবনাই কিন্তু ওঁদের চিন্তাতেও বড়ো অংশ জুড়ে ছিল — তাৎক্ষণিক বা প্রতিক্রিয়াবাদী হিংসাকে ওঁরা কেবল নিন্দাই করেননি, কমপক্ষে মাও তো বটেই — কিন্তু ওঁদের চিন্তার যে প্রেরণা, তাতে আছে প্রলেতারিয়েত, অর্থাৎ সবচেয়ে শোষিত পীড়িত যে সমাজ, তার শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে পরিবর্তন। সে শক্তি অস্ত্রের শক্তি নয়। অস্ত্রের জোর সামান্য কিছু মানুষের জোর হতে পারে। তাই যদি ওঁদের [মার্ক্স বা মাওয়ের] চিন্তাভাবনাকে ঠিকভাবে মানতে হয়, তাহলে অনেক বিকল্প গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, মঞ্চ, পথ, পদ্ধতি — এসবের কথা ভাবতে হবে। অর্থাৎ সেই 'কমিউন' পর্যন্ত একটা ভাবনা। সামাজিক স্তরে কীভাবে আমরা বাঁচব, কীভাবে আমরা জীবন চালাব, নিজেদের এক স্বাবলম্বী, স্বশাসিত সমাজ নির্মাণ করব — এইসবের চিন্তাও কিন্তু ওখানে আছে। অর্থাৎ আমাদের সম্পদের ওপর আমাদের দখল — এই যে কথা মার্ক্সে আছে। অর্থাৎ সেই দখল করার পর কী, তারও এক দর্শন মার্ক্সে আছে। একভাবে ওই দর্শনই আপনি গান্ধীতে পাবেন, টলস্টয়ে পাবেন। কারণ, শেষ পর্যন্ত এই দুনিয়ায় কী করতে হবে, কীভাবে বাঁচতে হবে, সেটাই শেষ কথা। তাই আপনি মারপিট যাই করুন, শেষে কিন্তু আপনাকে এই বিন্দুতেই আসতে হবে। তা সেই বিন্দুতে যাওয়ার রাস্তাতেই যদি আমরা অন্য দর্শন দিই, তাহলে ওই দর্শনই আমাদের নজর থেকে সরে যায় বলে আমার মনে হয়। এটা হতে পারে না। আপনি হিংসা দিয়ে হিংসাকে দূর করতে চান, এই চিন্তাকে আমার বিকৃত চিন্তা বলেই মনে হয়। তাই আজকের রাজনীতিতে আমি আছি বটে। কিন্তু এই হিংসা আমাকে হিংসাপন্থী বানাতে পারবে না।

জি.ন. : না, আপনাকে হিংসাপন্থী বানাতে পারবে না। কিন্তু একটা জটিলতা আছে, যেটা আমরা নন্দীগ্রামে দেখেছি, লালগড়েও দেখছি। মাও সেতুঙের চিন্তায় যেমন আছে, আপাতত আপনি কিছু হিংসা করেই থাকতে পারেন, যখন আপনাকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে, কিন্তু দর্শনের জায়গায় আছে যে গণভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, গণআন্দোলনের ওপর দাঁড়িয়ে করা। কিন্তু এই আপাতত হিংসার যে কর্মসূচি, তা চলছে তো চলছেই, বহুদিন হয়ে গেছে। এই যে কমিউনিস্ট পার্টি, মাওবাদী পার্টি, এও তো আজকের কথা নয়। এসব আমাদের দেশে অনেক দিন ধরে চলছে। আর গণ আন্দোলনও তো এমন জিনিস নয় যে তা অনন্তকাল ধরে চলবে। গণআন্দোলন হয়েছে নন্দীগ্রামে। তারপর আবার লোকে শান্ত হয়ে গেছে। ফের আরেক জায়গায় হচ্ছে, যেন একটা ঝড়ের মতো, আজ এখানে তো কাল সেখানে। গণ আন্দোলন যখন এক জায়গায় থেমে যাচ্ছে, তখনও কিন্তু পার্টিগুলো চলছে, আর তার হিংসাও থামছে না। এটা একটা পয়েন্ট। দ্বিতীয় একটা পয়েন্ট হল, আপনি বা যারা দলীয় রাজনীতির মধ্যে নেই, তারা হয়তো একটু অন্যভাবে রাজনীতিকে ভাবতে চায়, অহিংসার পথে থাকতে চায়। কিন্তু ওইসব দল এগুলোকে — যেমন, মানবাধিকার সংগঠন বা এনএপিএম বা সিভিল সোসাইটি সংগঠনকে — খানিকটা ঢালের মতো ব্যবহার করতে চায়, হিংসার কর্মসূচিকে আড়াল করার জন্য। ওরা ভাবে, ওদের যা লক্ষ্য, হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে দখল করা, তাতে আমরা কায়েম আছি, মাঝপথে এইসব লোকেদের আমরা খানিক সময়ের জন্য ব্যবহার করে নিচ্ছি। রাজনৈতিক দলগুলির ভাবনায় কিন্তু এটা আছে। নন্দীগ্রামেও আপনি দেখুন তৃণমূল কী করল। সিপিএম তো প্রথম থেকেই নন্দীগ্রামে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে চলেছে। কিন্তু তৃণমূলও কিছু কম যায়নি ওখানে। অস্ত্রের কথাও সকলেই জানে। সংখ্যার হিসেবে ওরা হয়তো দশটা করেছে, এরা হয়তো দুটো করেছে। কিন্তু আমি নীতির কথা বলছি, দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিতের কথা বলছি। এই পরিস্থিতিতে আপনার যে অহিংসার পথ, সেই রাস্তায় কীভাবে এগোবেন?

মে.পা. : আপনি বলছেন বটে, তবুও আমার মনে হয়, বেশিরভাগ মানুষ আজও অহিংস। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়, শান্তিতে বেঁচে থাকে এবং আরেকজনের ওপর হিংসা বা অত্যাচার করে না। তা না হলে তো বহুৎ খুন খারাপি হত। রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা হাসিল করার কথা যদি আপনি তোলেন, তাহলে আমি বলব, তারা কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতিতেই আছে। তাদের ভাবনার মধ্যেই আছে ক্ষমতা দখল করার ফন্দি ফিকির, কারণ তারা মনে করে ওভাবেই পরিবর্তন আনা সম্ভব। জনআন্দোলনের মধ্যে থেকেও ক্ষমতার রাজনীতি হতে পারে। এই দুই একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। পার্টিগুলিও জনআন্দোলনে থাকতে পারে। এখানে দুটো রাস্তা আছে। একই ব্যক্তি দুই রাস্তাই নিতে পারে (ক্ষমতার রাজনীতি এবং জনআন্দোলন); অথবা আলাদা আলাদা মানুষ, আলাদা

গোষ্ঠী, আলাদা সংগঠন আলাদা আলাদাভাবে এই দুই রাস্তার কোন-না-কোনটাতে শামিল হল। তাই রূপের দিক থেকে এখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক সচেতনতা, রাজনৈতিক প্রশাসন।

জি.ন. : ক্ষমতার রাজনীতিতে হিংসা তো তার অঙ্গ স্বরূপ (in-built) —

মে.পা. : আমার এরকম মনে হয় না। যদি ক্ষমতার রাজনীতিতে হিংসা অঙ্গ স্বরূপ হয়, তাহলে আবার সেই আলাদা আলাদা স্তরের কথা আসবে। সেভাবে দেখলে, নর-নারীর সম্পর্কেও ক্ষমতার রাজনীতি আছে। তাতেও হিংসা অঙ্গ স্বরূপ। যদি আমরা মানসিক হিংসা বা এই ধরনের স্তর অবধি যাই, তাহলে অন্য কথা। অন্যথায় আপনি যদি শারীরিক হিংসার স্তরেই থাকতে চান, এবং সেই মানসিক হিংসাটুকুই আসবে যার রূপ হবে অত্যাচার, তাহলে কিন্তু বলা যাবে না ক্ষমতার রাজনীতিতে হিংসা অঙ্গ স্বরূপ। এমনকী নির্বাচনী রাজনীতিতেও সময়ে সময়ে দেখা গেছে রাষ্ট্র ততটা হিংসাপ্রবণ হয়নি, পার্টিগুলোর মধ্যেও অহিংসাকে মূল্যবোধের জায়গায় স্থান দেওয়ার লোক রয়েছে। বিভিন্ন পার্টিতেই রয়েছে। এখন কি হচ্ছে, একদিকে যেমন টাকা এবং বাজারের কথা আসছে, তেমনি আসছে ক্ষমতার কথা। তারা এটাকে ব্যবহার করছে হাতিয়ার (tool) হিসেবে, এবং কখনও কখনও অস্ত্র (weapon) হিসেবে। কিন্তু সেটা রাজনীতির বদলে যাওয়া চরিত্রের কথা। ওটা যে এভাবেই চলবে বা এভাবেই চলা উচিত, তা কিন্তু আমার মনে হয় না। একই কথা কিন্তু জনসংগঠন বা আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিছু কিছু আন্দোলন বলতে চায়, হিংসা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তাই নেই। তাই বলে তাদের কথা মানতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তাদের যদি কোনও শক্তিশালী গণভিত্তি থাকে, এমনকী কমিটেড ক্যাডারও থাকতে পারে, তাও সেটা মানার প্রয়োজন নেই। আপনার মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কোন রাস্তা আপনি নেবেন, সেটা তো সমস্তরকম দরকষাকষির উর্ধে। আপনি অহিংসাকে দরকষাকষির উর্ধে স্থান দিচ্ছেন কিনা সেটা আসল কথা। একই কথা খাটে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও। তারা কেউ কেউ হিংসাকে আপত্তিকর বলে মানতেই চায় না। একই কথা প্রযোজ্য তাদের দুর্নীতির বেলাতেও। বাজার, দুর্নীতি এবং হিংসা — এই তিনটের আশ্রয় নেওয়া — সেটা কেউ [কোন দল] ক্ষমতায় আসতে চায় বলে নিচ্ছে, কোন কোন আন্দোলন নিজের নিজের দৃষ্টিতে পরিবর্তন চায় বলে নিচ্ছে — এই তিনের আশ্রয় একপ্রকারে মাওবাদীরাও নিচ্ছে, যারা কিনা অ-নির্বাচনী রাজনীতিতে আছে। হয়তো অন্তিম স্বার্থ আলাদা, কিন্তু আপনি রোজকার কার্যকলাপে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এমন কিছু ভিত্তি তৈরি করছেন, তাতে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আপনার নৈতিক কাঠামোটা কী। তারপর আপনি হঠাৎ করে শুধরে যাবেন, এটা তো হতে পারে না। এটা খুব স্ববিরোধী বলেই আমার মনে হয়। কল্পিত সূত্রায়নে হয়তো হতে পারে, আপনি অনেককে খুন করে শান্তির রাজ কায়েম করবেন, কিন্তু বাস্তবে মুশকিল।

নির্বাচনী রাজনীতিতে ক্ষমতা হাসিল করার জন্য অন্যকে ব্যবহার করার যে কথা বলছেন, আমার মনে হয় নিজের নিজের রাস্তায় অন্যকে ব্যবহার করা আপনি একেবারে বন্ধ বা অস্বীকার করতে পারবেন না। তারা তো ব্যবহার করার চেষ্টা করবেই। আমরাও যেমন সময় সময় কমিউনিটির ঐক্যকে ব্যবহার করি। কখনও গ্ল্যামারকে ব্যবহার করি, ক্যারিশমাকে ব্যবহার করি। কখনও স্থানীয় নেতৃত্বকে ব্যবহার করি। এরকম অভিযোগ তো আন্দোলন সম্পর্কেও করা হয়। এই ব্যবহার করা একটা লাগাতার ব্যাপার। ব্যবহার করা, ম্যানিপুলেট করা, কো-অপ্ট করা। তাই আপনি যে অভিযোগ করছেন, তা যেমন সত্য, কিন্তু তারও একটা সীমা (threshold) থাকা দরকার। এটা আমি মানি। তা যদি পেরিয়ে যাই, তবে তা ভুল। যদি সেই সীমার মধ্যে থাকি, তবে তা চলতে পারে, ন্যায্য। আপনি যে পার্টিগুলোর উদাহরণ দিচ্ছিলেন, ধরুন সমাজবাদী জন পরিষদ। এই পার্টিটার তো আপনাদের কাছে কোন অস্তিত্ব নেই, কারণ সেটা এখানে তো তেমন নেই। এদের ভাবনা কিন্তু আমাদের জনআন্দোলনের যে ভাবনা, একদম সেই রকম। এবার, একটা পার্টি হিসেবে এগিয়ে যেতে গিয়ে — আপনি বলবেন — — তারা আন্দোলনকে ব্যবহার করছে। আবার ওদের নিজেদের জায়গায় ওরা আন্দোলন ও সংগঠনকে উপায় হিসেবে নিচ্ছে, সেই উপায়ে তারা বাড়ছেও। কারণ, ওরা জানে যে আগামী নির্বাচন ওদের লড়তে হবে। অথবা, আপনি এই এসইউসিআই-এর কথা ধরুন। এভাবেই কেউ কেউ আন্দোলনের উপায়টা নেবে, অন্যকে ব্যবহার করবে। একটা সীমা পর্যন্ত এটা ন্যায্য, স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে অস্বাভাবিকতা চলে আসে। তাই যদি বলা হয়, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরকে সবাই ব্যবহার করেছে, তাহলে ওই আন্দোলনগুলোকেও অপমান করা হয়।

জি.ন. : আন্দোলনকে ব্যবহার করতে পারেনি, কিন্তু সংগঠনকে ব্যবহার করেছে।

মে.পা. : সংগঠনও তো আন্দোলনেরই অংশ। যদি আন্দোলন শেষ হয়ে যাবার পর সেটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নেয়, সেই সংগঠন আলাদা। যখন আন্দোলন চলে, তখন সংগঠন-আন্দোলন আলাদা নয়। সেখানে আন্দোলনকে ব্যবহার করা, কর্মসূচীকে ব্যবহার করা, অর্থাৎ লোক জড়ো হয়েছে, আমি ডায়াসে উঠে মাইকে বলতে শুরু করলাম, সেটা একটা দিক। কিন্তু ভালোভাবে ব্যবহার করা, এটা থেকে কিছু ক্যাডার নেওয়া, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে এরকম কিছু লোককে জড়িয়ে নেওয়া — এটা হয়, হচ্ছে। একটা সীমার মধ্যে যদি এটা হয়, তাহলে আপনি তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। আপনি তাকে এই দৃষ্টি থেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, তা যেন আন্দোলনকে হত্যা না করে। আন্দোলনের লক্ষ্যটাকে হত্যা না করে। কারণ কেবল তো আন্দোলনটা হত্যা করা হয় না, লক্ষ্যটাকেও অনেক সময় হত্যা করা হয়। এটাও হয়। এটা নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের পর নজর রাখা জরুরি। আমি বলব, আন্দোলনের পর মানুষ তো ভোট দেবেই। কেবল তা আন্দোলন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। এমনকী, আন্দোলনের সঙ্গে যে সমস্ত ব্যক্তিরা জড়িয়ে আছে, তারা কোন পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকবেই এমন নয়, তারাও নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে কোন না কোনভাবে।

জি.ন. : একটা কথা বলি, নন্দীগ্রামের বাই-ইলেকশনের সময় একটা চায়ের দোকানের আড্ডায় কথা হচ্ছিল। নন্দীগ্রামে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির দল এবং তৃণমূল প্রার্থী দিয়েছিল। সেখানে নন্দীগ্রামের কিছু ছেলে বলেছিল, আমরা জানি, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি তুলনায় অনেক ভালো, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অনেক আগে থেকে তিনি আছেন, কিন্তু উনি সিপিএমকে হারাতে পারবেন না, তাই আমরা ওঁকে ভোট দেব না, আমরা শুভেন্দু অধিকারীর ভোট সংগঠিত করব, তা সে শুভেন্দুর সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত লোক বা গুন্ডা যাই থাকুক। যে জনগণ গতকাল আন্দোলনের অংশ ছিল, তারাই কিন্তু আজ এই ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে।

মে.পা. : এটা তো একটা আপোশের এলাকা। যখন আপনাকে বাছতে হবে, এক তো আপনি সম্পূর্ণভাবে খারিজ করতে পারেন, সব পার্টিদের খারিজ করলেন। আর একটা হতে পারে, আপনি সব থেকে যে ভালো, তাকে ভোট দিলেন, সে হেরে যাবে জেনেও। তৃতীয় আর একটা উপায় আছে, কিছুটা আপোশ করো, পুরোটা কোরো না। কারণ আপনার নিজের স্বার্থ তো ওখানে নেই। এরকম মানুষের দিক থেকে আমি এটা দেখছি। আপনার নিজেরই যদি কোন স্বার্থ থাকে, তাহলে তো এসব কথাই অর্থহীন। এবার সাধারণ মানুষ এই তিন চারটে উপায় থেকে একটা বেছে নেয়। যেমন, সমাজও আলাদা আলাদা গণ্ডিতে চলে। কতটা আপোশহীন আপনি হতে পারেন? তাই এর

মধ্যেই একটা উপায় আমাদের বাছতে হয়। আমরা সবাই তো প্রত্যেকটা বিষয়েই কিছু না কিছু আপোশ করি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা আপোশ করি। আমাদের ভাবনাতেও আমরা আপোশ করি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে দেখি, আপোশের দৃষ্টিতে সে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নেয় — সেখানে সে ভালো-খারাপের যতটা বিবেচনা করে অংশ নিতে পারবে, ততটাই সে নির্বাচনী রাজনীতিকে একটা গণ্ডির মধ্যে রাখার ব্যাপারে মদত করতে পারবে। এ বাদ দিয়ে, আজকের দিনে যারা আপোশহীন অবস্থান নিচ্ছে, তারা প্রান্তিক, মূলধারার নয়। অর্থাৎ মানুষ তাদের সাথে নেই। আসলে ওখানে একটা দ্বন্দ্ব আছে। মানুষ যদি তাদের সাথে না থাকে তাহলে সে মূলধারার কীভাবে হবে? অর্থাৎ সমাজ কোথাও না কোথাও আপোশ করে করে এগোয়। এই কথাটা নিশ্চিত। আমরা যে সমাজ, আদর্শের কথা বলি, সেই সমাজও আপোশ করে করেই এগোয়। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে আপোশ না হোক আমি চাই, তার মধ্যে একটা বিষয় হল হিংসা। একটা হল দুর্নীতি। আমি দুর্নীতি বলতে বোঝাচ্ছি সম্পদের অন্যায় দখলদারি ... তো এইসব বিষয়ে সমাজ আপোশ না করুক এটাই আমার ইচ্ছা। আমরা এই মাঝামাঝি পথ ধরেই চলতে চাই। এই মাঝামাঝি পথে সমাজ কী করছে? সমাজ আজ বদলাতে বদলাতে তার চ্যালেঞ্জ এক ভিন্ন উপায়ে নিচ্ছে। বদলানো এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনী রাজনীতির যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া আমরা দেখতে চাই, তা এখনও সেই চ্যালেঞ্জ দিতে পারেনি। আন্দোলন এখনও সেই চ্যালেঞ্জ দেওয়ার ব্যাপারে অত শক্তিশালী নয়। আন্দোলন কীভাবে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে? দ্বিতীয় একটা পথ নিয়ে। এক ধরনের সমান্তরাল পথ নিয়ে। এবার আপনি যখন একটা সমান্তরাল পথ নিয়ে চলছেন, তখনও তো আপনি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে একটা সংলাপ চালাচ্ছেন।

গতকালের কথা বলছি। আমি মহারাষ্ট্রের একটা ধরনা থেকে উঠে সোজা এখানে এসেছি। গ্রামে জঙ্গলের অধিকারের ইস্যুতে একটা খুন হয়েছে। কংগ্রেসের বিধায়কের যে গোষ্ঠী আছে, তারা প্রত্যক্ষদর্শীদের কিডন্যাপ করে বিধায়কের ঘরে নিয়ে গেছে। এটা খবরের কাগজে চলে এসেছে। নিশ্চিতভাবে বিধায়ক জড়িত আছে ব্যাপারটায়। অবশ্যই তাকে গ্রেপ্তার করা দরকার। এবার আমরা কী পথ নেব? বাস্তব রাজনীতিতে আমাদের অবশ্যই বিজেপি বা অন্য বিরোধী দলগুলির সাহায্য নেওয়া দরকার। আমরা কিন্তু তাদের নিয়ে আসিনি। আমরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সঙ্গে নিতে চাই না। আপনি হয়তো কে কমিউনাল আর কে সেকুলার, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু মোটা দাগে আমি কথাটা বলছি। আমাদের সাথীরা জিজ্ঞেস করেছিল, ওদের ডাকব, নাকি ডাকব না। আমি বলেছি, কখনই ডাকব না। ওরা এসে গেল। তখন আমরা তাদের সাথে কথা বলিনি এমনটা নয়। কারণ নির্বাচন আসছে, ওরা আসবেই। আমরা ওদের সাথে কথা বলেছি। কিন্তু ওদের মঞ্চে তুলে দিইনি। একটা দূর পর্যন্ত সবটাই নিরবচ্ছিন্নতায় দেখার ব্যাপার আছে। ওখানে সরকারে বসে আছে কংগ্রেস। আমরা কংগ্রেস পার্টির সরকারের সাথে কথা বলব কি না? আমরা তো কথা বলি। তো, কোথাও না কোথাও আমরা আপোশ করেই থাকি। এবার আমরা তো খোলাখুলিই বলছি যে বিধায়ক খুন করেছে। এইভাবে খোলাখুলি কথা তো কেউই বলতে পারবে না। আমরা সেটা বলছি। একই সাথে আমরা তৃতীয় একটা পথও নিচ্ছি। সেটা হল, আমাদের ওই গ্রামটার অধিকার দিতে হবে। হত্যা তো হয়েই গেছে। এবার কমপক্ষে জমি দখলটা যাতে না হয়। আমি তো এখানে চলে এসেছি। আমাদের লোকেরা ওখানে ধরনা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাল রাত বারোটায় উঠে গেছে, যে জমি দখল হবে না। এবার এই যে আমাদের একজন খুন হয়ে গেছে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের হাতে কী কী উপায় ছিল? এই হত্যার কিনারার জন্য বাকি সব পার্টিগুলিকে ব্যবহার করো, পার্লামেন্টারি যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ রয়েছে, তাকে কাজে লাগাও। দ্বিতীয় একটা পথ ছিল, আমাদের নিজেদের লোকেদের এককাট্টা করে ওদের ওপর হামলা করো। অন্য গ্রামের যে লোকেদের ওরা ভুল বুঝিয়েছে, তারা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের বিরুদ্ধে। ওই গ্রাম কিন্তু এরকম ছিল না। আমরা জানি ওরা কেন এমন করছে। তাই আমরা এখনও আশা রাখি, ওই গ্রামসমাজটাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। বুঝবে, আদিবাসী সংস্কৃতি, আদিবাসী জীবন কাকে বলে। তাই আমরা কিন্তু এখনও হামলা করিনি। কারণ তা দিয়ে কোন দীর্ঘমেয়াদী সমাধান বেরোবে না। তাই আমার কথা হল, আজকের পরিস্থিতিতেও, এমনকী বিভিন্ন পার্টির মধ্যেও বিভিন্ন উপায় রয়েছে। আপনাকে তার মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে। তার ফলে আপনি জিততেও পারেন, হারতেও পারেন। আন্দোলনের সামনেও উপায় আছে। এরকম নয় যে কোনও উপায় নেই, কোন বিকল্প নেই। আপনি হারবেন জেনেও আপোশহীন থেকে যেতে পারেন। এবার আপনি তৃণমূলের কাছ থেকে এটা আশা করতে পারেন না। কারণ তাদের পরিষ্কার পথ হল ক্ষমতায় আসা এবং তারপর বদল ঘটানো। মাওবাদীদের কাছ থেকেও আপনি কিন্তু এটা আশা করতে পারেন না। মাওবাদী বা নকশালবাদীদের মধ্যেও এখন আলাদা আলাদা চিন্তা আছে। আপনি মাওবাদকে নিষিদ্ধ করতে পারেন না। মানুষ মাও পড়বে। মানুষ মাওবাদ পড়বে। এ কী পাগলামো, মাওবাদীদের নিষিদ্ধ করা! সরকারের একটা ছেলেমানুষী! সে কথা উঠছে না। যারা সশস্ত্র সংগ্রামে আছে, তাদের জন্য আমরা ব্রিটিশদের একটা আইন নিয়ে চলছি। তা নিজেই একটা অভিশাপ। কিন্তু নির্বাচনী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, আইন এবং সাংবিধানিক পরিকাঠামোয় এই ধরনের আইনের সাহায্য তারা নেবে, এর তো আমরাই স্বীকৃতি দিয়েছি, আমরাই ন্যায্যতা দিয়েছি। তার বাইরে কিন্তু রাষ্ট্র কিছু করতে পারে না। ব্রিটিশরাও অনেক জিনিস ঢুকিয়েছে। আজ যখন দেখছি, নতুন নতুন এক একটা আইন আসছে, তখন সেই বিষয়ের পুরনো ব্রিটিশ আমলের আইনটা যখন পড়ে দেখছি, তখন দেখছি কত কিছু ওরা লিখেছিল, কত জিনিসই না ওরা ঢুকিয়েছিল।

জি.ন. : সেটা তো পুঁজিবাদের একটা পর্যায় ছিল, তখন সে এতটা আগ্রাসী ছিল না ...

মে.পা. : হ্যাঁ। সে যেমন ওয়েলফেয়ারিজম [কল্যাণসাধণ] নিয়ে চলেছে, লিবার্টিকেও [স্বাধীনতা] সঙ্গে নিয়েছে। আপনি বলবেন, লিবার্টিকে তারা – — আপনার কথা অনুযায়ী — ব্যবহার করেছে। জমি অধিগ্রহণ আইনে পাবলিক পারপাস-এর সংজ্ঞা নিয়ে যখন কথা উঠেছে, তখন গ্রামের কথা বলা আছে, গরিবেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু এরপর স্বাধীন ভারত যা যা করেছে, সেখানে কিন্তু সেসব কথা একেবারেই নেই। যা যা সংশোধন হচ্ছে, সব কর্পোরেটদের পক্ষে। তাই নিশ্চিতভাবেই এই পার্টিগুলির ওপর আমাদের লাগাম রাখা জরুরি। আন্দোলনের দ্বিতীয় একটা পর্যায় তো আসেই। সেটা হল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেওয়া (institutionalization)। সেখানেও একটা চ্যালেঞ্জ আছে। আন্দোলনের যেমন এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা হয়, সেটা হয় অ-নির্বাচনী প্রাতিষ্ঠানিকতা। সেখানে আপনি ট্র্যাডিশনাল প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পোস্টমর্ডার্ন প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত যেতে পারেন। যেমন আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তাদের স্বাতন্ত্র্য সামনে এল, তার ওপর দাঁড়িয়ে আপনারা আন্দোলন করলেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্যও পূরণ হয়ে গেল। এবার আপনি ফিরে যাবেন আপনার ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে। এটা কিন্তু পুরো একই সঙ্গে হতে পারে। বাস্তবত, নর্মদাতে আমাদের ওটাই করা উচিত। আমরা পুরোটা পারিনি। নর্মদাতে আমাদের লোকেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, এইভাবে চলব নাকি ওইভাবে চলব।

জি.ন. : মানে কি কৌমসমাজে ফিরে যাওয়া?

মে.পা. : নেতিবাচক অর্থে নয়। মানে কী ধরনের কৌম? ভৌগোলিক না স্বাভাবিক ক্রিয়ামূলক? তাই এটা কেবল ছোটো একটা স্তরের (micro level) কথা নয়, এটাকে সামাজিকভাবে দেখতে হবে। কৌম এবং সেটা ছাপিয়ে সমাজ — ওই স্তরেও কিন্তু একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে তো ভালোভাবেই ছিল। ঝাড়খণ্ডের মানুষ নর্মদার সাথে যুক্ত ছিল। কত না ভাষা ইত্যাদিতে ... অথচ এতখানি ছড়িয়ে। আমাদের গ্রামে একজন মানুষ আছেন, এখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়। চারদিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলাম। ... উনি আমার সাথে দেশের বহু জায়গা ঘুরেছেন। আপনি তো জানেন, নর্মদার আদিবাসীরা সব জায়গায় যেতেন। ওঁর কিন্তু ভূগোল ভীষণ ভালো জানা ছিল। এটা কীভাবে হল? আসলে সমাজে কোথাও একটা ভাবনা ছিল, পুরনো সমাজে। সেটা এতখানি ছড়িয়ে ছিল, কিন্তু এই ভাবনাটা ছিল। আদিবাসী গ্রাম কিন্তু ছোটো করে হলেও এটারই এক অবিকল প্রতিরূপ। তারা হয়তো অনেক খারাপ আছে, কিন্তু তারা অনেক বেশি সংগঠিত এবং সংহত (integrated)। আর আমাদের দেখুন, এত গায়ে গায়ে ঘর, কিন্তু কোনও সংহতি নেই। তাই সেই সমাজের যে বিভিন্ন স্তরের রূপ তা এই প্রাতিষ্ঠানিকরণের একটা পুরোদস্তুর কাঠামো হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের দিকটাও আছে। আবার মুখিয়াগিরিও আছে। আদর্শ গণতন্ত্রের দিক দিয়ে দেখলে আদিবাসী মুখিয়াও কম স্বৈরাচারী নয়। কিন্তু ওটা প্রতিষ্ঠানের একটা কাঠামো। পরিবারে আপনি এটা যেমন বলতে পারেন না, বাবা আপনি তো স্বৈরাচারী হয়ে গেছেন। ওটা একটা বিকৃতি। মানব সমাজ এই বিভিন্নতা নিয়েই তো চলে। আন্দোলন এই দিশাতেও যেতে পারে, এই নতুন প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে পারে। যেমন, এখন ওটারই একটা আলাদা রূপ চলছে, গ্রামসভাকে গুরুত্ব দেওয়া। আদিবাসী সংগঠনগুলো এই ব্যাপারটা আগেই বাস্তবায়িত করে দিয়েছে। এখন আমাদের দিক থেকে তো এটা নর্মদাতে একটা বড়ো দাবি হয়ে উঠেছে। কোর্ট থেকে আমরা আদেশও বের করেছি যে, গ্রামসভাকে না জিজ্ঞেস করে আপনি জমি নিতে পারবেন না। আমরা যখন কেবল দাবি করছিলাম তখন আলাদা কথা ছিল। এখন আদালতের আদেশ যখন এসে গেল, যা গ্রামসভা বলবে তা-ই হবে। এই গ্রামসভাও তো আজ ভেঙেচুরে গেছে, আদিবাসীদের গ্রামেও। আদিবাসীরাও এখন কেউ কাঠের ব্যবসা করছে, কেউ অন্য কিছু করছে। একদম পাহাড়ি এলাকায় কিছুটা অন্যরকম পাওয়া যায়। তাই তাদের সবকিছু একইরকম থাকবে, তা তো নয়। তো প্রতিষ্ঠানের এক নয়া কাঠামো নির্মাণ করা আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ। আমরা ট্র্যাডিশনালি যেরকম ছিলাম সেরকম থাকতে পারব না; এবং আজকের যে নির্বাচনী রাজনীতির প্রতিষ্ঠান তাকেও পুরো মানতে পারছি না। এই প্রাতিষ্ঠানিকরণের দিকে যেতে গেলে আমরা কিছু বদল তো মানবই। আন্দোলন যেমন ছিল তেমন থাকবে এরকম তো হবে না। আন্দোলনের পর মানুষ নির্বাচনে অংশ নেবে। যদি আন্দোলনের নেতৃত্ব কোনও বিকল্প না রাখতে পারে, তাহলে মানুষ ভোটই দেবে না, এরকম একটা বিকল্প হতে পারে। কিন্তু সেটা থেকে সরে এসে মানুষ যদি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে তো সে কাউকে না কাউকে ভোট দিয়ে দেবেই। এর মধ্যে এটাই তো ভালো যে, আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছিল, তারাই ভোটটা পেল। এটাই আমাদের আপোশ হবে ওই সময়ে। কিন্তু এটা হতে হবে যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকতার বাকি যে ক্ষেত্রগুলো, সেগুলোও সাথে সাথে শক্তিশালী হতে হতে যাওয়া প্রয়োজন। যাতে ওই পার্টির ওপর লাগাম রাখা যায়। ও যেই সীমা ছাড়াবে, নীতিগত বা স্ট্র্যাটেজিক সীমা, শুধু হিংসা–অহিংসা নয়, সে সাধারণভাবে যখন দুর্নীতি করবে, আমরা যে দাবি করছি তা মানবে না, যেসবের বিরুদ্ধে লড়াই তাই লাগু করতে শুরু করবে, ওই ধরনেরই প্রজেক্ট আনতে শুরু করবে, বহুজাতিকদের আনতে শুরু করে দেবে, তখন আবার যাতে আন্দোলন খাড়া হয়ে যেতে পারে। এভাবেও একটা চলমান বিপ্লবের প্রক্রিয়া চলতে পারে। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে এরকমটাই হবে বলে মনে হচ্ছে। এমনকী মাওবাদী বা সশস্ত্র আন্দোলনের লোকেদের মাধ্যমেও যদি কোথাও আন্দোলন হয়ে যায়, আমার মনে হয় না তারা মানুষকে আটকাতে পারবে এই আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড়ে যাওয়া থেকে। ওরা নিজেরাই তো নেপালে যাচ্ছে। এখানে যদি ওরা সরাসরি এখনকার ক্ষমতার রাজনীতিতে আসা পর্যন্ত না-ও যায়, তাহলেও ওদের লোকজন তো যাবেই, যাচ্ছেও। এর জন্য যেভাবে হোক মানুষকে ধরে রাখতে গিয়ে ওরাও বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে, কোনও একটা দ্বিতীয় ফ্রন্ট বানাচ্ছে, বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য নিচ্ছে। এটা বৃহত্তর অর্থে ক্ষমতার রাজনীতির একটা ডায়নামিক্স। আন্দোলনও এই বৃহত্তর ক্ষমতার রাজনীতি। জনগণের ক্ষমতাকে সামনে আনা, তার জন্য আপোশ, তার জন্য বিভিন্ন শক্তিকে ব্যবহার — সেটা আমরাও করি। আমরা গ্রামে সরকারি আধিকারিককে ডাকি। আমরা তো জানি, যদি বারবার সরকারি আধিকারিক আসে, তবে গ্রামসমাজ আন্দোলনের শক্তিকে আরও বেশি করে অনুভব করবে। কেউ যদি না আসে, কেউ কথা না বলে, তবে তো আন্দোলন চৌপাট হয়ে যাবে। সেটাও তো আপোশ, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। এই অবধি তো ঠিক আছে। এবার ওই কাঁটাই যদি হাত কাটতে শুরু করে — কিংবা দেখা যাচ্ছে তা কাঁটা তুলছে, কিন্তু আসলে আরও বড়ো কাঁটা তৈরি করছে, তাহলে তো তা প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে।

জি.ন. : কিন্তু রাষ্ট্রও তো চায় ওটা থাকুক। আমেরিকা তো চায় তালিবান থাকুক। আপনি দেখুন শ্রীলঙ্কায় কী হল। শ্রীলঙ্কা তো ছিল সংগঠিত হিংসার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, শেষমেষ কী হল?

মে.পা. : হ্যাঁ, আপনি যদি মাইক্রো (ক্ষুদ্রতর) স্তরে দেখেন, তবে তা একরকম, আর ম্যাক্রো (বৃহত্তর) স্তরে তো আরও বেশি। আমার মনে হয় আজ আমাদের আরও বেশি করে হিংসাকে প্রশ্ন করা দরকার। ... সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তনের ধারণায় কারো কারো ভরসা আছে। কেউ হয়তো এখনই তা শুরু করতে চায় না বা পুরোপুরি সেই পথ নেয়নি। তারা অহিংসাকে মনে করে এক সাধু ধারণা (saintly attitude)। না, অহিংসা কোন সাধু ধারণা নয়। হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে যে সাধু ধারণা আছে, মায়া দয়া আছে, সেগুলো তো ঠিকই। তাই [অহিংসা] একেবারে অসাধারণ একটা ব্যাপার, মানুষের সাধ্যের অতীত একটা কিছু, এটা তো আমি মানি না। এটা একটা মৌলিক মানবিক শক্তি, মানবিক গুণ। বরং হিংসাই হল বিকৃতি, পারভারশন, অ্যাবারেশন।

এবার নন্দীগ্রামের মানুষ, তাদের মধ্যে তৃণমূল আছে, আরও কেউ আছে। আমি বলছি, নন্দীগ্রামের জনতার ওপর কেউ কেউ হামলা করছে, এখনও সিপিএমের লোকেদের সেখানে তাড়াচ্ছে। আমাকে কিন্তু এর বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিতে হবে। আমি যদি সেক্ষেত্রে ভারসাম্য না রাখি, সেটা হয়তো আমার দুর্বলতা। আমি অবশ্যই আন্দোলনের অনেক বেশি কাছে, তার যন্ত্রণাটা আমি অনেক বেশি উপলব্ধি করি। কিন্তু তা বলে তা অন্যদের মারতে বা তাড়াতে পারে না। নন্দীগ্রামেও কিছু লোক হামলা করেছে। সেটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন? আমরা তাকে নিন্দাও করেছি। কিন্তু আমরা শুনেছি তারা কী করেছে, কী অত্যাচার করেছে। আপনাকে একজন ধর্ষণ করতে এসেছে, তখন আপনি তাকে খুন করেছেন। ট্র্যাডিশনাল আইনেও কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আমরাও তাকে ক্ষমা করে দিই। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী এবং বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন সেটাকে দেখি, আমরা অনুভব করি এটাও ঘটা উচিত হয়নি। যেমন, পার্টিকেও আমরা বড়ো প্রেক্ষিতে মানি না।

শ.স. : আপনি বললেন, অহিংসা সমাজে আছে। হিংসাও তো সমাজে আছে। বাবা যেমন ছেলেকে একটা থাপ্পড় মেরে দিল। এটাও তো বাস্তব।

মে.পা. : হ্যাঁ আছে, কিন্তু সমাজজীবনে তুলনায় অনেক বড়ো অংশ জুড়ে আছে অহিংসা। সেটাই মানবিক সমাজ। তা না হলে তো পাশবিক সমাজ হয়ে যাবে। আমরা পশু। কিন্তু সামাজিক পশু। এই ফারাকটা তো থাকা দরকার। এখন তো এর ফলে রাষ্ট্রের হিংসা ন্যায্যতা পাচ্ছে। এতো আরও বড়ো সমস্যা। এখন ওখানে তৃণমূল কংগ্রেস এসেছে, তো আন্দোলনের এই ক্ষমতা থাকা দরকার, যাতে তা ওদের বারবার এই প্রশ্ন করতে পারে। দাবিগুলি নিয়ে আমরা যাব না, এটা তো হতেই পারে না। তারা এখন ক্ষমতায়, তো তারা এইসব দাবিগুলি নিয়ে কী করবে তা তো আমরা নজর রাখব। এটা ধরে নিন একটা আপোশ। আদর্শ ব্যাপার হত, যদি কমিউনিটিই সিদ্ধান্ত নিত। এটাও এক ধরনের আপোশ, কিন্তু ... আমার তো খুব ইচ্ছে হয়, বাংলায় কত মানুষ কত চর্চা করে আন্দোলনের ওপর। তাদের তো নাক গলানোও (pouring input) দরকার। আপনি কেবল পার্টিকে দোষ দিয়েই থাকতে পারেন না। তারা তো খাটছে ওখানে। মেহনত করছে ওখানে। বাকি কেউ করছেই না। আমি আমাদের লোকেদেরও বলেছি। আমি এখন এখানে। আমার নর্মদাতে আন্দোলন চলছে। কেবল নর্মদাই নয়, আরও দশটা জায়গার আন্দোলনে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছি, অনেকটা নাক গলিয়ে (involved) আছি। এই সমস্ত আন্দোলনে এখন কী চলছে, তার সংগঠন কোনদিকে যাচ্ছে – এতদিকে আমাদের জড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আমরা কুলিয়ে উঠতে পারছি না। আমরা যেরকম চাই, সেরকম করে উঠতে পারছি না। বাংলার এত মানুষ, যারা নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে, তারা ওখানকার মাটিতে যদি যায়, তাহলে তো খুব ভালো হয়।

যাই হোক, এই আলাদা আলাদা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা, এগুলো সাথে সাথে চলবে। এক হলো পার্টি, এক হল নন-পার্টি, এক ট্র্যাডিশনাল ... সবাইকেই কাজ করতে হবে।

জি.ন. : আমি জিজ্ঞেস করছি, যেমন হিংসা কিছু পার্টির একটা উপায় (means), তেমনি অহিংসা কি কোনও দলের উপায় হতে পারে, নাকি তা এক সচেতন প্রচেষ্টার ব্যাপার? মার্ক্সবাদীরা মনে করে অহিংসা হল একটা কৌশল, হিংসা হল আরেকটা কৌশল। আপনি কী মনে করেন?

মে.পা. : এটা উপায় হয়ে ওঠে। দরকার সচেতন প্রচেষ্টা। কিন্তু অহিংসা হল মূলত একটা ভ্যালু (মূল্যবোধ)। সচেতন প্রয়াস থাকা দরকার যাতে নিজে অহিংস থাকা যায়, অন্যদের অহিংস রাখা যায়।

জি.ন. : কিন্তু চারিদিকের পরিস্থিতি আমাদের হিংসাত্মক করে তুলতে চায়। যেরকম আগ্রাসন আজ আমাদের ওপর, ইচ্ছে করে গিয়ে শপিং মল গুঁড়িয়ে দিয়ে আসি।

মে.পা. : এটা তো হবেই। কী হচ্ছে দেখুন? এত বুদ্ধিজীবী লালগড় নিয়ে এখানে মিছিল ধরনা করছে, তারা তো কেউ অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছে না। তারা তো নিরস্ত্রই থাকছে, যাতে তারা নিজেরা সুরক্ষিত থাকতে পারে। কিন্তু তারা লালগড়ের হিংসাকে যুক্তিসঙ্গত বলছে। এটার ফল ভুগছে ওখানকার সাধারণ মানুষ। কিন্তু এটা তো ভাবার বিষয়, আপনারা সবাই মিলে কেন লালগড়ের দিকে যাচ্ছেন না হাতে একটা করে লাঠি নিয়ে? মাওবাদীদের নয়, রাষ্ট্রের যে হিংসা, তাকে নিকেশ করার জন্য। পঞ্চাশটা লোকও তো লালগড় যাচ্ছে না। যারা এটা করছে না, যারা কেবল একটা তাত্ত্বিক বিতর্কে আগ্রহী, তাদের পথ হিংসার বা অন্য কিছুর — এ তো আমি মানি না। তারা খুবই ভীতু প্রকৃতির। এমনকী অহিংস কর্মসূচিতেও তারা নামবে না, কারণ রাষ্ট্র হিংসার আশ্রয় নেবে। ওখানেও তারা ভয় পায়। অন্তত কিছু লোক আছে, নিজেরা অহিংস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে, অহিংস উপায়েই হিংসাকে সমর্থন করে, কিন্তু নিজেরা হিংসার পথ নেয় না। এরকম মানুষও অনেক বড়ো সংখ্যায় আছে। এরা স্বাভাবিকভাবে হিংসাপন্থী, এটা বলা যাবে না। স্বাভাবিকভাবে এরা অহিংস।

জি.ন. : এরা হিংসা প্রচার করে?

মে.পা. : তা নয়, হিংসাকে ন্যায্য মনে করে।

জিনগত মারণযজ্ঞ পারমাণবিক মারণযজ্ঞের চেয়েও ধ্বংসাত্মক

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ১৩ এপ্রিলের 'হিন্দু' পত্রিকার খবরে প্রকাশ, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি'কে (জিইএসি) সাদরে তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভারতীয় জিন বিজ্ঞানী ও 'জিনক্যাম্পেন'-এর আহ্বায়ক শ্রী সুমন সহায় যে জনস্বার্থ রক্ষার মামলা করেছিলেন, তার ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়। নির্দেশিকাগুলি হল : জিইএসি-কে ১. প্রস্তাবিত জেনেটিকালি মডিফায়েড বা জিএম শস্যের কোন বিষাক্ত বা অ্যালার্জেটিক প্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে; ২. যে জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ওই শস্য ফলানো হবে, তা থেকে অন্যান্য জমি যাতে সংক্রমিত না হতে পারে, তার জন্য কতটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে; ৩. পরীক্ষালব্ধ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে ওয়েবসাইটে দিতে হবে, যাতে বিশেষজ্ঞরা স্বতন্ত্রভাবে ওই তথ্যগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। আক্ষরিকভাবে লেখা এই নির্দেশিকার মর্মার্থ যদি মেনে চলা যায়, তাহলে উন্নত-জিনের কারবারিরা পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গাকে তছনছ করার যে আয়োজন ফেঁদেছে তা থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

'এশিয়া-প্যাসিফিক জুরিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' চন্ডীগড়ে 'আইন ও পরিবেশ' নামক যে সেমিনারের আয়োজন করেছিল, সেখানে মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে আবার সতর্ক করেছেন যে, কর্পোরেট সংস্থাগুলো "প্রকৃতির ক্ষতির বিনিময়ে দ্রুত মুনাফা বাড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।" তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে পরিবেশের দিক থেকে বিচার করে সন্দেহজনক মনে হলে যে কোনও প্রকল্পকে বাতিল করা উচিত। এগুলো অবশ্যই প্রাজ্ঞ-পরামর্শ এবং সদর্থক বিজ্ঞানের যে মৌলিক কথা সেই 'সতর্কতামূলক নীতি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'জেনেটিক মডিফিকেশন' কথাটা অনেকেই জানেন। এটাকে 'ট্রান্সজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিং', 'হরাইজনটাল জিনট্রান্সফার টেকনোলজি' এবং 'রিকমবিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজি'ও বলা হয়। ২০০৯ সালে এসে একে 'সন্দেহজনক' প্রকল্প বলা মানে অনেকটা খাটো করে দেখা। মানুষ যতরকম টেকনোলজি বা প্রকৌশল সম্পর্কে জানে এটা তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। পরমাণু বোমা বানানোর টেকনোলজির থেকেও তা মারাত্মক। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার পরে মানুষ সেটা ব্যবহার না করে রেখেও দিতে পারে। কিন্তু 'ট্রান্সজেনিক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর উৎপন্ন বস্তুগুলো জন্মানো মাত্র তাদের 'চেইন রি-অ্যাকশন' বা শৃঙ্খলবিক্রিয়া অদম্যগতিতে চলতে থাকে।

এখানে এই টেকনোলজির প্রাথমিক বিষয়টাকে একটু দেখা দরকার। সংজ্ঞার্থে ট্রান্সজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিং হল, কোনও জৈবের জিনকে অন্য প্রজাতির কোন জৈবের জিনের মধ্যে ঢোকানো। উদাহরণ স্বরূপ শুয়োরের জিনকে টমাটোর মধ্যে বা সাপের জিনকে ফুলের মধ্যে ঢোকানো হল। যেহেতু প্রত্যেকটা জৈবপ্রজাতির নিজস্ব স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে বাইরের কোন একটা জিন ঢোকাতে গেলে একটা বাহক লাগে, যে বাহক ওই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙে ঢুকে যাবে। সাধারণত কোন ভাইরাস বা অনেকগুলো ভাইরাসের সমষ্টি বা সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া এই বাহকের কাজ করে। প্রাকৃতিক নিয়মকে এরকম ভয়ঙ্করভাবে ভেঙে ফেলা কি কোনরকম উপকারে লাগতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল : যে প্রজাতির কয়েকটি বিশেষ জৈবের মধ্যে বাইরের জিন ঢোকানো হল, তা কি ওই কয়েকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? বিজ্ঞান এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলছে, "যে কোষগুলো বহিরাগত জিনের বাহক হিসেবে কাজ করে সেগুলোর স্বাভাবিক ধর্ম হল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া।" এর অর্থ হল বহিরাগত জিন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং ওই প্রজাতির অন্যান্যদের ভিতরে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ সংক্রমণের মাধ্যমে প্রবেশ করে যাবে। এটা একটা দানবিক প্রকৌশল। উদ্ভিদ ও প্রাণীরাজ্যের প্রত্যেকটা প্রজাতির জিনগত বৈশিষ্ট্যকে এটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। এটা জিনগত মারণযজ্ঞ। অবশ্যই পারমাণবিক মারণযজ্ঞর চেয়েও এটা মারাত্মক। ষাট বছর পর পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমায় ঘাসের অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়েছে। কিন্তু ট্রান্সজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কুফল কিছুতেই মোছা যাবে না এবং এটা অনন্তকাল চলতেই থাকবে।

১৯৬০-এর দশকে বোরলং যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলেন এবং আজকে যে ট্রান্সজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে ঠেলে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে — – এই দুইয়ের মধ্যে এক বিশাল তফাৎ। ওই জন্যেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজির প্রখ্যাত অধ্যাপক চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী শ্রদ্ধেয় জর্জ ওয়াল্ড এই নতুন ধারণা মাথাচাড়া দেওয়া মাত্র এর ফলাফল নিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দে এক সতর্কবানী দিয়েছিলেন, "রিকমবিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজি আমাদের সমাজকে যে সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়েছে তা শুধু বিজ্ঞানের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর বুকে প্রাণের ইতিহাসেও অভূতপূর্ব। তিনশ কোটি বছরের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে উৎপাদিত আজকের যে জীববৈচিত্র্য তাকে ইচ্ছে মতো ভাঙাগড়ার ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে এই টেকনোলজি। জীববৈচিত্র্যের যে প্রাকৃতিক নিয়মে আগে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, যেমন পশুর বা গাছের সংমিশ্রণ, তার সঙ্গে আজকের হস্তক্ষেপকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। আগের প্রত্যেকটা কাজের পদ্ধতি ছিল একটা বিশেষ প্রজাতি বা খুব কাছাকাছি দুটো প্রজাতি নিয়ে। ... এতদিন আমাদের নৈতিকতা ছিল — প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যা শিখতে পারি তার সর্ব ক্ষেত্রেই বিনা বাধায় এগিয়ে যাওয়া। প্রকৃতিকে পুনর্গঠন করার কোনও বাজি আমরা খেলিনি ... আজকের (নতুন) ধারণা শুধুমাত্র প্রাজ্ঞতার অভাব নয় এটা বিপজ্জনকও বটে। এটা পশু ও উদ্ভিদ জগতে নতুন অসুখ ছড়াতে পারে, ক্যানসারের নতুন উৎস ও নতুন নতুন অসুখের মহামারীর কারণ হতে পারে।"

এর গোপন চরিত্রকে লুকিয়ে রাখার জন্যই জিএম সামগ্রীর বিক্রেতারা চাষিদের লোভ দেখানোর জন্য মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেয়; বলে, এতে উৎপাদন বেশি হবে এবং কীটনাশকও কম লাগবে — শুনে মনে হবে এগুলো যেন পরিবেশবান্ধব। অন্য কিছু কোম্পানি আবার বিজ্ঞাপনে বলে যে আগাছা দূর করার ওষুধ দিলেও ওই বীজের উৎপাদনে কোনও ক্ষতি হবে না।

এরা এমনভাবে প্রতারণা করে যে, অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষও অনেকসময় বিভ্রান্ত হয়। ১ মে ২০০৯-এর টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়ার দিল্লি সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জিএমও নিয়ে জনস্বার্থ সুরক্ষার এক মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সহ তিন সদস্যের বিচারমণ্ডলীর একজন মাননীয় বিচারক বলেন, "জিএম খাদ্য যেহেতু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই তা ভারতের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমাধান করতে পারে ... জিএম বীজের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার থেকে দারিদ্র্য আরও বেশি বিপজ্জনক।

যদি মাননীয় বিচারপতি মহাশয় একটু কষ্ট করে আর্জেন্টিনার মানুষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, উগান্ডার চাষি ও আমাদের দেশের বিটি তুলো উৎপাদকদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতাগুলো জানার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি দ্রুত তার মত পালটে ফেলবেন। যেসব দেশে 'জিএম শস্যের সাহায্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ'-এর চেষ্টা হয়েছিল, তাদের অল্প কিছু অভিজ্ঞতার সামান্য উল্লেখ এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে।

১) যে আর্জেন্টিনা তাদের জনগণের প্রয়োজনের আটগুণ উদ্বৃত্ত স্বাস্থ্যকর বিভিন্ন রকমের খাদ্য উৎপাদন করতে পারত, তারা ব্যাপকহারে জিএম সয়া-শস্য ব্যবহারের পর এখন দুধ, মুসুর ডাল, শুঁটি ও তুলো আমদানি করে এবং জিএম-শস্যের দয়ায়, "কৃষিবিষের ফলে সারাদেশের জনগণ নানা অসুখে ভুগছে।"

২) দক্ষিণ আমেরিকায় জিএম তুলো, উগান্ডায় জিএম মিষ্টি আলু এবং কেনিয়াতে জিএম ভুট্টা ও জিএম মিষ্টি আলু উৎপাদনের ফলে সর্বত্র ফলনের অভাব, অদ্ভুত সব আগাছার জন্ম এবং সেগুলোকে মারার জন্য আরও বিষ ও আরও কীটনাশকের ব্যবহার, মাটি আরও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং মানুষ ও পশুর নতুন নতুন রকমের অসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

৩) আমাদের দেশে বিটি তুলো (ব্যাসিলাস থারিনজায়েনসিস) নামে যে জিএম তুলো সীমিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে — তার জন্য বেশি খরচ ও কম উৎপাদন চাষিদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

৪) ইংল্যান্ডে রয়াল সোসাইটি কৃষিখামারে পর পর তিন বসন্তে তিন বছর জিএম শস্য (রেপসিড তেল, বিট ও ভুট্টা) উৎপাদন করে দেখিয়েছে — কীভাবে তা জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করছে, যা কিনা কৃষির সুষ্ঠু বিকাশের মৌলিক প্রয়োজন। রয়াল সোসাইটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে জিনের প্রবাহ, জিন থেকে জিনে সংক্রমণ, সহজে মারা যায় না এমন আগাছা বা পোকামাকড়ের জন্ম — এসব নিয়ে তারা কোন প্রশ্ন তুলবে না, তারা শুধু দেখবে জিএম শস্য খামারের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করছে কিনা।

৫) খোদ আমেরিকায় সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, 'রাউন্ড আপ রেডি' নামক জিএম সয়াবিন বীজের উৎপাদন ক্ষমতা চালু বীজের থেকে কম। তবুও মনসান্টো, নোভার্টিস, দ্যু পোঁ ইত্যাদি কোম্পানিগুলো এমন ক্ষমতাশালী এবং তাদের হাত এত লম্বা যে তারা এখন জিএম শস্য নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, এটা লক্ষ্যণীয় যে মেক্সিকো শুধু জিএম শস্যের চাষ নয়, তা নিয়ে গবেষণাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে জিএম বিরোধী মানসিকতা এত শক্তিশালী যে জিএমও উৎপাদকদের নেতৃস্থানীয় মনসান্টো সেখানে তাদের বার্লি বীজ উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে ২০০৩ সালেই। ভেষজ ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রেও তাদের ওই ধরনের গবেষণা তারা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। যদি জিএম শস্য এতই বিপদের হয়, তাহলে আমেরিকানরা, যারা এক দশকেরও বেশি ধরে জিএম শস্য খাচ্ছে, তারা কেন ব্যাপকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে না? উত্তর হল, জিএম শস্য খাওয়া মাত্রই কেউ মারা যায় না। তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়া ও অ্যালার্জি ছাড়া অন্য কোনরকম ক্ষতি হতে লম্বা সময় লাগে। ঠিক যেমন অনেকদিন ধরে ধূমপানের পরেই তামাকের থেকে ক্যানসার রোগ ধরা পড়ে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আমেরিকান নাগরিকদের স্বাস্থ্যমানের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। জোনাথন ক্যাম্পবেলস্ প্রকাশনার 'জেনেটিকালি মডিফায়েড খাদ্যের পঞ্চাশটি ক্ষতিকারক দিক' নামক একটি সমীক্ষাপত্রে নাথান বি ব্যাটেলিয়ন বলছেন, "১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র একজন মানুষের ক্যানসার হয়েছিল, দুজন পুরুষে একজন এবং তিনজন মহিলায় একজন ক্যানসারে আক্রান্ত। জল, বাতাস ও খাদ্যের দূষণ গত এক শতাব্দী ধরে এই অসুখকে বাড়িয়েছে ঠিকই। কিন্তু এটাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে অ্যান্টিবায়োটিক, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি হিসেবে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের বৃদ্ধি। এর ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে গেছে 'গোটা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার ধারাবাহিকভাবে ভেঙে পড়া।"

জিএম শস্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার চালু আছে। আগের অনুচ্ছেদে যে সমীক্ষাপত্রের কথা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, একাধিক রাসায়নিকের যুগ্ম ব্যবহারে, (বিশেষত কীটনাশক) যে পরিমাণ ক্যানসার হয় তা অনেক রাসায়নিকের একক ব্যবহারের সমষ্টির চেয়ে হাজারগুণ বেশি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হল, যে রাসায়নিকগুলোকে এককভাবে ক্ষতিকর নয় মনে হয়েছিল, সেগুলোও অন্য রাসায়নিকের মিশ্রণে মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এক কথায় জিএম শস্যর মধ্যেই রয়েছে দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, অসুখ ও মৃত্যুর বীজ। এবার দেখা দরকার, শুরুতে সুপ্রিম কোর্টের যে সাদর পরামর্শের উল্লেখ করা হয়েছে, তা এড়িয়ে যাওয়ার কায়দাগুলোকে কীভাবে আটকানো যায় :

১) সকলেই এখন জানে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), যারা জিএম শস্য চাষ করা বা না করার নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী, তাদের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদের অফিসারদের সাথে জিএমও উৎপাদক সংস্থাগুলোর কিছু লোকের যোগাযোগ আছে এবং তারা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকে। ভারতবর্ষে জিইএসি-র সদস্যদের মধ্যে কতজন স্বাধীন-স্বতন্ত্র ও সৎ অবস্থান গ্রহণ করে আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে তা খতিয়ে দেখা দরকার। আজকের কথা বলতে, সেখানে আছে ভারতের 'সেন্টার অফ মলিকুলার বায়োলজি স্টাডিজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশক ড. পি এস ভারগবের মতো লোক, যাঁর বক্তব্য জনগণের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যায়; কিন্তু তাঁর কন্ঠস্বর জিইএসি-তে চেপে রাখা হয়েছে। জিইএসিতে সাচ্চা পরিবেশবিদদের এখন কোন স্থান নেই। জিইএসিতে কারা থাকবে তা কারা ঠিক করবে?

২) যেহেতু ট্রান্সজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিং গুলি চালানোর মতো হিংস্রতা, এখানে তা জীবকোষের পর্দা ফুঁড়ে চলে যায়, তাই এটা কি উচিত নয় যে জমিতে কোনরকম জিন শস্য লাগানোর আগে জিইএসির প্রতিটা সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টে বিতর্কের জন্য রাখতে হবে।

৩) ইতিহাসে এই প্রথম, জিএমও বিষয়টাকে কেন্দ্র করে নতুন ধরনের এক চক্র গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে শিক্ষাবিদ-শিল্পপতি ও সামরিকবাহিনী আছে (আগে ছিল এটা শিল্প-সামরিক জোট বা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স)। ফলে এর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিস্তরে কোনও মুক্ত ও নিরপেক্ষ বিতর্ক চালানো কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সম্মানীয় বিজ্ঞান-বিষয়ক জার্নাল বা পত্রিকাগুলো যেমন 'সায়েন্স', 'নেচার', 'নিউ সায়েন্টিস্ট', 'ল্যানসেট' — এরা কর্পোরেট সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপন ও স্পনসরশিপের ওপর এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে প্রায়শই বায়োটেক বিষয়ক (পড়ুন, জিএমও বিষয়ক) প্রবন্ধগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। প্রথমদিকে যারা এর কুফলগুলো নিয়ে সতর্ক করেছিল, তাদের মতের পক্ষে বিজ্ঞানীরা কোনও গবেষণাপত্র পাঠালে এই পত্রিকাগুলো তা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। একমাত্র খোলাখুলি বিতর্কসভায় কৃষকরা অংশগ্রহণ করলেই এই বিষয়ে মীমাংসা করা যায়। যদি বিতর্কগুলো শুধু উচ্চ পদাধিকারী বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যাশাগুলো বিফলেই যাবে।

৪) ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে জিএম শস্য প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আমেরিকার কৃষি বাণিজ্য যে সংস্থাগুলো আরও বেশি করে মুনাফা তুলতে চাইছে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে — এসবই করছে 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' ও 'ক্ষুধা নিবারণ'-এর নাম করে। যদি তারা বীজের বাজার এবং তার স্বাভাবিক সহায়ক কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্যের বাজার একচেটিয়াভাবে দখল করতে পারে, তাহলে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী কর্পোরেট সংস্থা হয়ে উঠতে পারবে। সেইজন্যই তারা চাইবে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে গবেষণা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে। জিএম প্রকল্পগুলো যে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে একেবারেই অকেজো সে বিষয়ে এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় 'থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক — আফ্রিকা', যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়ার পর শেষে মন্তব্য করেছে, "ওরা এই দাবি করছে জিএম শস্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে প্রশমিত করে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার একটা কায়দা হিসেবে এবং ওরা সুকৌশলে প্রচুর টাকা ঢেলে ওদের পক্ষে প্রচার গড়ে তোলার জন্য একদল জিএম দালালকে ভাড়া করেছে।" "রাজনীতিবিদরা অন্য সময় গরিবদের কথা ভুলে গেলেও বায়োটেকনোলজির ক্ষেত্রে তাদের জন্য মড়াকান্না শুরু করেছে। শিক্ষাবিদরা আরেকরকম বাজে বকার জায়গা পেয়ে গেছে। কর্পোরেটরা তাদের জিএম প্রোডাক্ট বেচার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা তাদের প্রকল্পগুলোর জন্য টাকাও পেয়ে যাচ্ছে। এইসব অন্যায় প্রচারের ফলাফল হল এক বোবা বিতর্ক।"

৫) উপরোক্ত কায়দায় বিজ্ঞান ও কারিগরির সাথে যুক্ত মানুষগুলোকে নিজেদের বশে নিয়ে আসা ছাড়াও প্রশ্ন উঠবে এই বিষয়ে যে জিএম শস্য উৎপাদন হয় না এমন খেতগুলো থেকে এমন দূরত্বে কি জিএম শস্য উৎপাদন করা 'আদৌ সম্ভব' যাতে সংক্রমণ না ছড়ায়? কানাডার একটা বিখ্যাত ঘটনা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। মানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিল, জিএম শস্যর পরাগরেণু কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। তারা দেখেছিল, গমের পরাগ বাতাসে একঘন্টা থাকতে পারে। এর সাথে যদি বাতাসের গতিবেগ যোগ করা যায় — যা ঘন্টায় ৩৫ কিমি, তাহলে কতদূর যাবে? ক্যানোলা পরাগ বাতাসে প্রায় তিন ঘন্টা টেকে। অতএব যদি বাতাসের বেগ ঘন্টায় ৩৫ কিমি হয়, তাহলে দুটো খেতকে বিচ্ছিন্ন রাখতে গেলে মাঝে কতটা দূরত্ব রাখতে হবে! আর যদি ওই পরাগ ঘুর্ণি বাতাসে পড়ে তাহলে ঘন্টায় ৬০ কিমিও যেতে পারে।"

আমাদের দেশে এই সমস্যা আরও বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে। অতএব নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এখানে আরও বেশি সমস্যার হবে।

এর সমাধান হল জিএম চাষ ও জিএম গবেষণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। যেরকমটা বলেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী-দার্শনিক হাইজেনবার্গ, দানবিক কারিগরি শিল্পগুলিকে কখনোই ছাড় না দেওয়া।

গদিতে বসে যারা রাজনীতি করে তারা বলবে : জিএম শস্য ও রাসায়নিক ব্যবহার না করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কি কোনও উপায়

আছে? আমাদের দেশে অসংখ্য উদাহরণ আছে যেখানে এইসব প্রকৃতিবিরুদ্ধ পদ্ধতির পরিবর্তে কেঁচোর সাহায্যে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে পরিমাণগত ও গুণগতভাবে অনেক বেশি উৎপাদন করা হয়।

দেড় দশক আগে "অর্গানিক ফার্মিং সোর্স বুক" (জৈব চাষের উৎস গ্রন্থ) নামে একটা বই প্রকাশিত হয়েছিল, এখন সেটা আবার প্রকাশ করেছে 'আদার বুক স্টোর', মাপুসা, গোয়া। এই বইতে যেসব ঘটনা

... *শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায়*

এক মালয়ালি মুম্বইবাসীর বঙ্গদর্শন

কে. হরিদাস

এবছরের ২৮ মে যখন কলকাতায় পৌঁছলাম, আমার বহুদিনের স্বপ্নটা পূরণ হল। আমাদের ছাত্রাবস্থায়, সাতাত্তরে বামফ্রন্টের বিজয়মিছিলে আমরা অংশ নিয়েছিলাম। সে ছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীর দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে বেরোনোর প্রতীকস্বরূপ। বামফ্রন্ট ছিল আমাদের কাছে এমন এক মডেল যাকে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে বলে সেদিন মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন বামফ্রন্ট তার জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল, ধারণাগুলো মিশ্রিত এক রূপ নিল। কারণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালিদের বলতে শুনতাম, পরপর নির্বাচনে বামফ্রন্টের এই যে বিজয়লাভ, সেটা তার কাজের দরুণ আসছে না, আসছে ক্যাডারদের বাহুবলের জোরে। তারা প্রায়ই বলত, আমার রাজ্য কেরলের সিপিএম আর পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম অনেক আলাদা। যখন তাদের বলা হত, কেরালার ব্যাপারস্যাপারও আর আগের মতো সুখকর নয়, তারা কিন্তু নিজেদের মতেই অটল থাকত।

সে যাই হোক, এবার আমার কলকাতায় আসার সময়টা ছিল সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গকে বোঝার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। লোকসভা ভোটের ফল দু'সপ্তাহ আগে বেরিয়েছে এবং তিনদশক পর প্রথমবারের জন্য বামফ্রন্ট হারের মুখোমুখি হয়েছে। 'আইলা' যেভাবে কয়েকটি জেলার উপকূল অঞ্চলকে বিপর্যস্ত করেছে, বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা খবরের শিরোনামে এসেছে, শুধুমাত্র তা এই ঝড়জনিত ধ্বংসের কারণে নয়, বরং ত্রাণের কাজে প্রশাসনের উদাসীনতা ও অবহেলার অভিযোগও এর কারণ হিসেবে খবরে এসেছে। 'মন্থন' পত্রিকার সম্পাদক আমায় এব্যাপারে যেসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ডাঃ অমিতাভ চৌধুরি। তিনি আমাকে জয়গোপালপুর বিকাশ কেন্দ্রের ত্রাণের দলে ঢুকিয়ে দিলেন। সেই দলটা ত্রাণ বন্টন করতে নৌকা নিয়ে কালিদাসপুরে গিয়েছিল। আমি সুন্দরবন ও মরিচঝাঁপির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ রোমাঞ্চিত ছিলাম। কারণ জায়গাদুটোর কথা আমি আগে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। সব মিলিয়ে এই সফর গ্রামবাংলা, সেখানকার মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রা বোঝার পক্ষে আমার কাছে বেশ কার্যকর ছিল।

গোড়াতেই বলে রাখি, আমি এসেছিলাম মুম্বই থেকে এবং এখানে আসার কারণটা ছিল মুম্বইয়ের সঙ্গে কলকাতাকে তুলনা করা দেখা। মুম্বইয়ে মানুষের চলাফেরা, আচার-ব্যবহার আর পোশাকে যে স্পষ্ট শ্রেণী বিভাজন নজর কাড়ে, কলকাতায় সেটা নেই। প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যাটাও এখানে কম বলেই মনে হয়। লোকজন কথাবার্তার সময় আমাকে বলেছে, সিঙ্গুরের কারখানা গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনার পর্বেও এই শহরে টাটার এক লাখ টাকার ন্যানো গাড়ি কেনার লোক কমই ছিল। সুবিধাপ্রাপ্তি ও বিলাসিতার প্রতি এই উদাসীনতাই বোধ হয় এক সমতাবাদী মেজাজের পরিচয় দেয়, যা বাঙালি সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে গড়ে তুলেছে। কলকাতা হল সাধারণ মানুষের শহর। অন্যান্য বড়ো শহরের তুলনায় এখানে জীবনধারণের খরচ কম। এক টাকায় চা আর একই দামে এক বান্ডিল বিড়ি অন্য খাবারদাবারের মতোই এর উদাহরণ। কিন্তু এটাও আমি জেনেছি, এখানে মজুরিও তেমনভাবেই কম। আরও উল্লেখযোগ্য, লোকাল ট্রেন ও মেট্রোরেলে মুম্বইয়ের মতো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী নেই। বড়ো বস্তি এলাকা না থাকাটাও চোখে পড়ে। মুম্বইয়ে সৌন্দর্যায়নের চোটে বেশ কিছু জায়গায় গরিবেরা আশ্রয়হীন হয়েছে। বিশ্বায়নের পর এই প্রক্রিয়াটা বেশ গতি লাভ করলেও কলকাতায় মনে হয় তা এখনও বেশ ঢিমেতালেই চলছে। এখন অবধি ব্যাপারটা ভালোই।

আমি যখন বোলপুরে মণীষা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামলী খাস্তগীরের সঙ্গে দেখা করলাম, ওঁদের মুখ থেকে এক ভিন্ন কথা শুনতে পেলাম। সোমনাথ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নব্বইয়ের দশকে সেখানে গরিবদের হটিয়ে উন্নয়ন আনার প্রক্রিয়া শুরু করে। উন্নয়নের জন্য আদিবাসীদের জমি বড়োলোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটা বামফ্রন্ট বাংলা জুড়ে শুরু করল সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মধ্য দিয়ে। জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ অবশেষে সরকারকে নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করল। এই সংগ্রামী মেজাজই বঙ্গসমাজের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। সমাজের নিচুতলায় পৌঁছানো রাজনৈতিক চেতনা নিশ্চিতভাবে এই প্রক্রিয়াকে পুষ্ট করেছে। এখানে আমি দেখলাম, প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে মানুষ মমতা আর সিপিএম নিয়ে আলোচনা করছে। এটা চট করে কেরলি সমাজকে মনে পড়িয়ে দেয়। যদিও দুটো পার্থক্য আছে। এক, কেরালায় কিন্তু মানুষ এত সহজে জঙ্গি প্রতিরোধের পথ নেয় না, যা বাংলায় যেন স্বতস্ফূর্তভাবেই ঘটে। দুই, বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা প্রতারিত হতে হতে ওখানে অরাজনীতিকরণ খুব বেড়ে চলেছে। বাংলায় তা লক্ষ্য করা যায় না। একইভাবে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াতেও তফাত রয়েছে। আমার মনে হয়, এই প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসটাও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বেশ ভালো এবং গর্ব করার মতো। শুধুমাত্র সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের বেলাতেই নয়, আমি ওখানে থাকাকালীন লালগড়ে পুলিশি অভিযানের শুরুতেই অপর্ণা সেন ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের ওখানে যাওয়ার খবর ছিল। কেরলে এই প্রতিক্রিয়া অনেক দেরিতে হয় আর যখন হয় তখন তা এক সংকীর্ণ ভঙ্গিতে ঘটে। ফলে যারা আসে না, তারাও নিজেদের নীরবতার যুক্তি খুঁজে নেয়।

মহাশ্বেতা দেবী এক সাক্ষাৎকারে দুঃখের সঙ্গে বললেন, যখন প্লাচিমাদার জনসাধারণ তাদের পানীয় জলের ওপর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোকাকোলা কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিল, তখনও এই কেরলি বুদ্ধিজীবীরা উদাসীন ছিল। কেরলে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বদের প্রত্যেকে নিজস্ব কায়েমি স্বার্থে কোন না কোন শিবিরের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করে; অথবা প্রচারের আলোয় থাকার জন্য প্রত্যেকে সেটা করতে বাধ্য হয়। এই দলীয়তার কারণে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিশীলতার ক্ষয় ঘটে। ফলে কেরালা এদের জাতীয় স্তরে জায়গা করে নেওয়ার মতো যোগ্য করে তুলতে পারে না। সকলেই জানে বাংলা এব্যাপারে অনেক এগিয়ে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবটা বেশ কম। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতে যারা থেকেছে, তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে, এব্যাপারে বাংলা অনেক এগিয়ে। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে এখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সহনশীলতা বজায় রেখেছে এবং ২৭% মুসলমানেরাও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

দুই রাজ্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে তুলনাটা আসে, তা হল বামফ্রন্ট সরকারের কাজের তুলনা। এই প্রসঙ্গে নিম্নবিত্তদের দুরবস্থা সরাসরি দেখার পাশাপাশি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাটা বেশ কাজে লেগেছে। উভয় রাজ্যে ভূমিসংস্কারের পদক্ষেপগুলোর তুলনা করে দেবব্রতবাবু বলেন, উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ কেরলের থেকে ভালো ফল দেখিয়েছে। যাদের হাতে জমির মালিকানা ছিল, ভূমিসংস্কার আইন লাগু হওয়ার আগেই তার কিছু অংশ আত্মীয়স্বজনের হাতে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কেরালায় সফল হয়েছিল। ফলে বন্টনযোগ্য জমির পরিমাণ সেখানে ভয়ানক কমে গেল। দেবব্রতবাবুর মতে, পশ্চিমবঙ্গে এই হাতবদল হতে পারেনি। তার কৃতিত্ব হরেকৃষ্ণ কোঙারের। কেরালায় আদিবাসী ছাড়া প্রায় সমস্ত ভূমিহীন চাষিকে দশ শতক করে জমি দেওয়া হয়েছিল। বাংলায় ভূমিহীনেরা জমির স্বত্ব পায়নি। এটা আজ খেতমজুরদের অগ্রগতির পক্ষে এক বড়ো বাধা। নতুন প্রজন্মের লোকেরা এসে দেখছে, জমির ওপর ঋণ ইত্যাদি বহু সরকারি প্রকল্পে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। দেবব্রতবাবু মনে করেন, আগের প্রজন্মের মতো এই নতুনেরা আর সিপিএমের সঙ্গে আবেগবন্ধনে জড়িয়ে নেই। তাই আজ তারা সিপিএমের প্রতি মোহমুক্ত। সত্তরের দশকের গোড়ায় কেরালাতে যখন ভূমিসংস্কার আইন শেষপর্যন্ত লাগু হল, একই সঙ্গে এসেছিল গৃহহীনদের জন্য এক লক্ষ গৃহের প্রকল্প। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যেও কেরালা ভালো ফল দেখিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সরকার ক্রমাগত এই দুটি ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। তার ফলটা আগেই বলেছি।

কেরলে ভূমিসংস্কার যতই আংশিক এবং অসন্তোষজনক হোক না কেন, যেটা উল্লেখ্য, সেখানকার বামেরা যতবার ক্ষমতায় এসেছে, শ্রমিকশ্রেণীর জন্য কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষিমজুরদের জন্য পেনশন (যার পরিমাণ বেশ কম এবং বন্টনে প্রায়শই নানা বাধা পেতে হয়েছে), প্রচলিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ইত্যাদি। অন্যদিকে, বাংলায় কৃষিমজুর বা লক্ষ লক্ষ রিকশাওয়ালাদের জন্য এরকম কোন ছোটোখাটো চেষ্টাও করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, কেরলের বামেরা 'কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' (KSSP)-এর মাধ্যমে ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা এবং প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছে (যদিও পরবর্তীকালে KSSP-র ওপর বিদেশি তহবিল সংগ্রহের অভিযোগ এসেছে, যা তারা খারিজ করতে পারেনি)। বিপরীতে বাংলায়, ইতিমধ্যে প্রকাশিত নানান পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, উচ্চমাত্রায় গ্রামীণ দারিদ্র ও ইস্কুল ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণে বাংলার বামেদের বাধাটা কী ছিল? গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, রাস্তা এবং যানবাহনের অবস্থা — বিশেষত বাংলার গ্রামাঞ্চলে — একইরকম শোচনীয়। বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীদের স্বার্থরক্ষাকারী সংবিধানের অধীনে কাজ করার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এইসব ক্ষেত্রগুলোতে উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা যেত। দুই রাজ্যের বামেদের মধ্যে এই তুলনা থেকে একটা স্পষ্ট চিত্র উঠে আসে, একের পর এক নির্বাচনে জয়লাভ করে বাংলার বামেরা উত্তরোত্তর আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের ভুলত্রুটি শোধরানোর কথা ভুলে গেছে। অন্যদিকে, কেরালায় একবার অন্তর একবার হেরে যাওয়ায় মানুষের সমস্যাগুলোর প্রতি সংবেদনশীল থাকতে বামেরা বাধ্য হয়েছে অথবা এব্যাপারে চেষ্টা করার একটা ভান অন্তত তাদের থেকেছে। যদিও ইদানীং কয়েক বছর কেরালার বামেরাও বোধহয় বাংলার বামেদের মতোই আচরণ করতে শুরু করেছে। একটা চিন্তা গেঁড়ে বসেছে যে, সরকারের কাজ সম্পর্কে নজর দেওয়ার চেষ্টা করা অর্থহীন; কারণ সরকারের মেয়াদ একবার শেষ হলে, যত যা-ই চেষ্টা করা হোক পরাজয় আসবেই। ব্যাপক দুর্নীতি, সমালোচকদের কন্ঠরোধ, বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের পদক্ষেপ গ্রহণ, সমাজের উচ্চবিত্তদের পক্ষে খোলাখুলি ওকালতি, পার্টির নেতাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন — এইসব ঝোঁকের বেড়ে চলা, অন্য কারণের পাশাপাশি, ওই চিন্তারই প্রভাব। যদিও মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দনের নেতৃত্বে কেরল সিপিএমে এই ঝোঁকের একটা বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। বাংলার ইউনিটে এধরনের বিচ্যুতির কোন বিরোধিতা গড়ে উঠেছে কিনা জানা নেই। এটাও উল্লেখ করা দরকার, কেরলে মুখ্যমন্ত্রী যে বিরোধিতা দেখাচ্ছেন, তার কোন তাত্ত্বিক রূপ নেই অথবা এই বিরোধিতার কোন স্পষ্ট মতাদর্শগত আকার দেওয়া হয়নি। সিপিএম পরিচালিত 'প্রোগ্রেসিভ আর্ট অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম'-এর নেতা প্রয়াত এম. এন. বিজয়ন একমাত্র এই ধরনের একটা চেষ্টা করেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত KSSP-র সঙ্গে যুক্ত কিছু সিপিএম নেতার মাধ্যমে উপস্থাপিত 'চতুর্থ পৃথিবী'-র তত্ত্বে এর প্রকাশ ঘটেছিল। NGO-দের অর্থের জোগানদার সাম্রাজ্যবাদ-পুষ্ট অ-কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে কিছুদিন প্রকাশ্য তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। অধ্যাপক বিজয়নের অনুগামীরা অভিযোগ তুলেছিল যে KSSP-ও সন্দেহজনক সূত্র থেকে বিদেশি অর্থ পাচ্ছে। কেরালার বর্তমান অর্থমন্ত্রী থমাস আইজাকের নেতৃত্বে ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে বামফ্রন্টের জমানায় যে জনসাধারণের পরিকল্পনা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, সেটাও ছিল বাস্তবে এক সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প। এমনকী থমাস আইজাক অধ্যাপক বিজয়ন এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলাও করেছিলেন। কিন্তু আদালত তা খারিজ করে দেয় এবং বলে বিজয়নদের হাতে অভিযোগের সপক্ষে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। অধ্যাপক বিজয়নের বেশিরভাগ অনুগামী এখন সিপিএমের বাইরে। হয় তারা বহিষ্কৃত হয়েছে, নয় দল ছেড়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও গ্রামাঞ্চলে NGO-দের উপস্থিতি এবং অনুপ্রবেশ মনে হয় বাড়ছে। আমি এখানে এসে শুনলাম, সিপিএমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন NGO চালাচ্ছে, এমন বহু উদাহরণ বাংলায় রয়েছে। NGO-দের ভূমিকা নিয়ে সম্ভবত বাংলায় কোন তর্ক হয়নি। এব্যাপারে বামপন্থীদের যে মনোভাব থাকা উচিত ছিল, সেটাও দেখা যায়নি। সম্ভবত এরকম একটা তর্ক হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে ওই তর্ক বামপন্থীদের মতাদর্শগত প্রশ্নগুলোর ওপর আলোকপাত করতে পারত। সিপিএম ও তার এতদিনকার সমর্থকদের মধ্যে বিরোধের পটভূমিতে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটা দরকার, সেখানে ভিতরকার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রশ্নগুলোতে স্পষ্টতা জরুরি। এর অভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিরাজমান সিপিএম-বিরোধী মনোভাব তরলায়িত হয়ে যেন শেষপর্যন্ত এক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে পর্যবসিত হচ্ছে। এখানে মমতা ব্যানার্জি কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারছেন, এটা বড়ো ব্যাপার নয়। যে মাওবাদীরা কতগুলো ভৌগোলিকভাবে সুবিধাজনক এলাকায় আবদ্ধ এবং পুরোপুরি সামরিক পথের ওপর নির্ভরশীল, তাদের হয়তো জনগণের কাছে — ডঃ অশোক মিত্রের ভাষায় 'মার্ডারার্স অ্যানার্কি' ছাড়া — আর কোন প্রতিজ্ঞাই দেওয়ার নেই। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অতীতের সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগের শিক্ষাগুলো সম্পর্কে তাদের কোন দৃষ্টি নেই বলেই মনে হয়।

আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে এখানে একথা উল্লেখ না করে পারছি না যে, রাজ্যের অগ্রগতির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সেইসব বুদ্ধিজীবী, যারা এখনও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ, তাদের এক বড়ো ভূমিকা রয়েছে। ভবিষ্যত সম্পর্কে এক বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের খুঁজে নিতে হবে। শুরু হবে অবশ্যই গ্রামবাংলা নিয়ে। ভূমিসংস্কার, পরিকল্পনা এবং গ্রামভিত্তিক কর্মনিবিড় শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা সমস্তরকম আন্তরিক চেষ্টায় ভেবে বার করতে হবে। এই দিকগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সঙ্গে যুক্ত এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন — যা জনসাধারণের কাছ থেকে শেখা এবং তাদের শিক্ষিত করতে প্রস্তুত — অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, এটাই

মনে হয় আজকের বাংলার দাবি। নিঃসন্দেহে বাংলার মানুষের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস তাদের এইসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা ভুলিনি, যখন সারা দেশে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলছে, এই রাজ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতে পেরেছে। সমস্ত বর্ণের সাম্পদায়িক শক্তিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে শেষপর্যন্ত প্রতিরোধের এক অনন্য নজির গড়ে তুলেছে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা দেশে এ হল আগামীদিনের আশা।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে চলেছে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বেশ কয়েকবছরের মতো এবারও মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের ফল বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দূরদর্শনে-সংবাদপত্রে হৈ-হৈ শুরু হয়ে যায়। গ্রাম-মফঃস্বল-শহরের বেশ কিছু সফল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সারাদিন ধরে চলতে থাকে নানা সাক্ষাৎকার-পরামর্শ-ঘোষণা। রাজ্যের খুদে-মাঝারি-বড়ো সব ধরনের সরকারি শিক্ষাকর্তা-শিক্ষাবিদ-শিক্ষানুরাগীরা মতামত দিতে শুরু করেন, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। আর এই তাবৎ হৈ-চৈয়ের মূল প্রচার-উদ্দেশ্যটি হল দ্বিমাত্রিক। এ রাজ্যে (অন্য রাজ্যের তুলনায়) শিক্ষার মান দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। দুই, (বাম শাসনে থাকা) গ্রাম ও মফঃস্বলের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে। বন্ধনীর মধ্যে থাকা শব্দগুচ্ছ মুখে উচ্চারণ না করলেও, শরীরি ভাষায় হাজির থাকে সর্বদাই। কিন্তু ঠিক এর পরের অধ্যায়টি নিয়ে আর তত কথাবার্তা-প্রচার শোনা যায় না। ষাট-সত্তর-আশি শতাংশ নম্বর বা সমসময়ের ভাষায় 'এ', 'এ-প্লাস', 'ডবল-এ' গ্রেড পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকেরা যে চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা ও চাপের মধ্য দিয়ে কাটায় বেশ কয়েকটা সপ্তাহ, সেই খবর প্রচার করা হয় না। সকাল থেকে বিকেল, এ স্কুল থেকে ও স্কুল বা কলেজে ছুটে বেড়াচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকেরা — ভর্তি হতে পারবে তো ভালো স্কুল বা কলেজে! নিদেনপক্ষে যে কোন একটা স্কুল বা কলেজে পছন্দের বিভাগ বা অনার্স পেতে ছুটে বেড়াচ্ছে বেশ মোটা নম্বর পাওয়া ছেলেমেয়েরা। বহু 'এ' বা 'এ-প্লাস' গ্রেড পাওয়া ছাত্রছাত্রীই কিন্তু তাদের পছন্দের বিভাগ বা অনার্স পাচ্ছে না। এমনকী সাধারণ স্নাতক পাঠক্রমের জন্যেও বেশিরভাগ কলেজে তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। এমন আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে, উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পরেও বেশ কিছু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার সুযোগই পাবে না। এ দায় কার? সে প্রশ্নের জবাব এই।

২২ শতাংশ যারা স্কুলছুট নয় ...

এতক্ষণের আলোচনা কিন্তু মূলত দশম শ্রেণী পর্যন্ত 'ড্রপ আউট' না হওয়া বা 'বিদ্যালয় ছেড়ে না দেওয়া' মাত্র ২২ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। কারণ এবঙ্গের প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলছুটের হার ৭৮.০৩ শতাংশ। যেখানে ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্তরে ড্রপ আউটের হিসাব ৫০-৫২ শতাংশ, একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে এরাজ্যের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা উপলব্ধি করা মোটেই শক্ত নয়। এখানে খুব বেশি হলে, পনেরো থেকে আঠারো শতাংশ 'এলিট স্কুল' বাদ দিলে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, মায় উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার প্রকৃত চিত্রটা কিন্তু গভীর উদ্বেগের। পাঠক্রম, পরিকাঠামো, শিক্ষাদান এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি — সব ক্ষেত্রগুলোতেই চমকে দেওয়া এক ঢালু পথ অনুসরণ করা হচ্ছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক (?) পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ফলস্বরূপ সাফল্যের পরিসংখ্যানের উচ্চকিত প্রচারের আড়ালে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধরে রাখার এক সচেতন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এই রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর এবং সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি। এক ধরনের 'রেজিমেন্টেশন' চলছে সর্বক্ষেত্রে। আর সেই বাধ্যতামূলক ফাঁস ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে রাজ্যের মুমূর্ষু শিক্ষাব্যবস্থাকে। কচি কচি শিশুরা কোন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে — ভাবলে যে কেউ শিউরে উঠবে।

পাঠক্রমের বিষয়

প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠক্রমের বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু, এটুকু বলা একান্ত প্রয়োজন, পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিক অন্তর্দৃষ্টির অভাব বড়ো প্রকট। বয়ঃক্রম, গাঁ-গঞ্জ-শহর-নগর, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ-আদিবাসী — শিক্ষার্থীদের এই ধরনের বহুস্তরের অবস্থান বিচার করে পাঠক্রম তৈরি হয় না, অন্তত এরাজ্যে এখনও পর্যন্ত হয়নি। ছাত্রদের দৈনন্দিন বাস্তবতা, যাপন, অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব, স্বপ্ন, চাহিদা, সামর্থ্য — কোন কিছুই প্রায় প্রতিফলিত করে না বর্তমান পাঠক্রম। এলিট স্কুল বা কলেজগুলো 'ব্যুরোক্র্যাট', 'টেকনোক্র্যাট' ইত্যাদি তৈরির যে দিশা দেখিয়ে চলেছে, সাম্প্রতিক পাঠক্রমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই পথ আরও বেশি বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর। মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং বিত্তবানদের আদরের দুলালদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্রতী করা হচ্ছে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাকে। আর এই প্রয়াসের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে ৭৮ শতাংশ স্কুলছুটের কারণগুলোর সিংহভাগটাই। ওই যে পনেরো শতাংশ অভিভাবক, যারা মোটা টাকা ব্যয় করে তাদের সন্তানদের 'টিউশন', 'কোচিং' ইত্যাদির ব্যবস্থা করে, সেই সন্তানরাই 'নোট' মুখস্থ করে উত্তরপত্রে উগলে দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো ফল করে। ৪-৫ শতাংশ 'খুব ভালো স্কুল' বাদ দিলে এলিট স্কুলগুলোর অধিকাংশতেও শিক্ষাদান তথৈবচ। তথাকথিত শিক্ষার মান প্রায় পুরোটাই গৃহশিক্ষকতার ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে যে ৭৮ শতাংশ পিতামাতার সেই আর্থিক ক্ষমতা নেই, তাদের সন্তানেরা কোনরকমে প্রাইমারির গণ্ডি পেরোয় বা সেভেন-এইট অবধি যায়। খুব বেশি হলে মাধ্যমিক। তাই এই তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক', 'সংশোধিত', 'ছাত্র অভিমুখী' 'জ্ঞানমূলক' পাঠক্রম, সিংহভাগ গাঁ-গঞ্জ-মফঃস্বলের নিম্নবিত্ত, গরিব মানুষের সন্তানদের কিছুই প্রায় দেয় না। আর সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত ছোটো এবং প্রকৃত অর্থে শিক্ষা সচেতন অংশ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে — 'প্রশাসক', 'বেসরকারি বহুজাতিকের মালবিক্রেতা' প্রস্তুতকারী এই পাঠক্রমে উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশকে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করা হয় না। 'কেন'-র থেকে 'কীভাবে'-কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর এই পাঠক্রম তৈরি এবং তার গুণপনা প্রচারের জন্য সেইসব 'রেজিমেন্টেড', মধ্যমেধার সরকারি দলপন্থী শিক্ষাবিদদের ব্যবহার করা হয়, যারা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সন্ধান, শিক্ষার প্রতি প্রাণের টান, এত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্ববোধ, পাপবোধ — সব কিছু বাঁধা দিয়ে রেখেছে দলের কাছে। দলও খুব খুশি — সব ঘরে ঠিকঠাক ঘুঁটি বসিয়ে রাজনৈতিক ভিত শক্ত করে ভোটের বাক্স তো ভরা যাচ্ছে। ব্যস্, আর কী চাই! গরিব-গুর্বোদের আর শিক্ষিত হয়ে কাজ নেই। সর্বশিক্ষা? কেন? এ রাজ্য অনেক রাজ্যের থেকেই এগিয়ে।

পাঠক্রমে দুষণ

পাঠক্রমের ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা খুবই জরুরি। পুরো পাঠক্রম জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে, বিভিন্ন জায়গায় এক ধরনের সুপরিকল্পিত দূষণ আরম্ভ হয়েছে অনেকদিন ধরে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দ্বাদশ

শ্রেণীর ইংরেজি পাঠক্রমে জিম করবেটের লেখার একটি নির্বাচিত অংশ 'লাইফ অ্যাট মোকামা ঘাট' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বছর কয়েক আগে। এই লেখার মধ্যে শেষ অনুচ্ছেদটি জিম করবেটের লেখা নয়। শাসক দল তাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান ওই অনুচ্ছেদে জিম করবেটের জবানিতে বলিয়েছেন। কী ভয়ঙ্কর প্রবণতা! শিক্ষার মধ্যে দিয়ে স্তাবক তৈরির এইরকম জঘন্য চক্রান্ত আরও বহু শ্রেণীতে, বহু লেখার মধ্যে বিদ্যমান।

শিক্ষার পরিকাঠামো

শিক্ষার পরিকাঠামো নিয়েও খুব বড়াই করা হয় এই রাজ্যে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় প্রত্যেক বক্তৃতাতেই বলা হয়ে থাকে — এ রাজ্যে এত হাজার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সংখ্যাটা শুনতে খুব বড়ো লাগে। কিন্তু এটাও সেই চমক, একটা চতুর পরিসংখ্যান, সত্য গোপন করার কৌশল। এর থেকে কোন প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। আসল ছবিটা পেতে গেলে দেখতে হবে — এ রাজ্যে কত ছাত্রের বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা, একটা শ্রেণীতে কতজন ছাত্রের সুস্থ পঠন-পাঠন সম্ভব। তাহলেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে, মোট কত বিদ্যালয় প্রয়োজন। আর বোঝা যাবে এই 'এত হাজার বিদ্যালয়' দিয়ে 'সর্বশিক্ষা' কোনভাবেই সম্ভব নয়। স্কুলে স্কুলে একটা করে ঘর বাড়িয়ে সেই কাজ অসম্ভব। বহুল প্রচারিত সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসা। তার জন্য গ্রাম অভিযান, কর্মশালা, অভিমুখীকরণ ইত্যাদি বহুবিধ আয়োজন। অথচ প্রায় সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা নিচ্ছে এবং নির্বাচিত ছাত্রদের তালিকা বার করছে। তাহলে কী দাঁড়াল? স্কুলছুটদের স্কুলে আসা তো দূর অস্ত, যাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে স্বাভাবিক নিয়মে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কথা, তাদেরও একটা নির্বাচিত অংশকেই ভর্তি করা হচ্ছে। প্রচুর ছাত্র এই পরীক্ষায় সফল হচ্ছে না। তার কারণ অবশ্যই আছে, তা যথাসময়ে আলোচিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা কী করবে? 'ডোনেশন' নেওয়া হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট ফি'-এর আড়ালে। আর ভর্তি হতে চাওয়া ছাত্রের সংখ্যা বেশি, অথচ সিট কম – তাই চাহিদা-জোগানের সূত্র মেনে ডোনেশনের পরিমাণ উর্ধগামী। যে বাবা-মায়েরা ধারদেনা করেও নাগাল পাচ্ছে না, তাদের ছেলেমেয়েদের কী হবে? প্রধান শিক্ষক বা পরিচালন সমিতি নানাবিধ যুক্তি দিচ্ছে — বিদ্যালয়ের মান বজায় রাখা, ছাত্র বসানোর জায়গার অভাব, শিক্ষক কম ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে সর্বশিক্ষারই বা কী মানে দাঁড়াল আর পরিকাঠামো নিয়ে বড়াই করাই বা কতটা অর্থপূর্ণ হল?

যথেষ্ট শিক্ষক নেই, তাই ...

রাজ্যের বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। একজন বা দু'জন শিক্ষক নিয়ে অসংখ্য বিদ্যালয় চলছে। তার মধ্যে একজন শিক্ষক মিড-ডে মিল নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকেন বা কোথাও ব্যস্ততার ভান করেন যে তিনি ক্লাস প্রায় নেন না। এইসব বিদ্যালয়ের পরিচিত দৃশ্য — একজন বা দু'জন শিক্ষক একটি বা দু'টি শ্রেণীতে পড়াচ্ছেন আর বাকি দু'টি শ্রেণীতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। ওই বিশৃঙ্খলা থামাতে ওই শিক্ষকেরা মাঝেমাঝেই উঠে আসছেন অথবা ছাত্রেরা তাঁদের কাছে আট-দশবার করে নালিশ জানাতে যাচ্ছে। অতএব যে শ্রেণীতে তিনি পড়াচ্ছিলেন, সেখানেও পড়াশুনা তথৈবচ। শ্রেণীতে অত্যন্ত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, ফলত স্থানাভাব; শ্রেণী চালানোর জন্যে ন্যূনতম শিক্ষকের অভাব; তার ওপর বহির্মূল্যায়ন, গ্রামসমীক্ষা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ, বর্ষায় জল পড়ে চাল দিয়ে; বন্যায় লোক ওঠে স্কুলে — ইত্যাদি জীবনের নানা ওঠাপড়া এবং শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ছাত্রদের পঠন-পাঠন বাকিই রয়ে যায়। অতএব বকাঝকা, শাসন-বিরক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের মনে এবং ছাত্রছাত্রীদের মনস্তত্ত্বে কখন যে শিক্ষক ঢুকিয়ে দেন সেই মহামন্ত্র — 'সবাই পাশ' — তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না বা বুঝে নেন ঢালু পথ ধরে। ফলে জীবনের প্রথম যে চার-পাঁচটা বছরে সামনে-খোলা-মাঠ-ইস্কুলে একজন ছাত্র তার মতো করে শিখে নেয় শৃঙ্খলা, গড়ে তোলে সু-অভ্যাস, গুটি গুটি মূল্যবোধ, অনুভবগুলো দানা বাঁধে তার মনে, সে শিখে নেয় — 'কী করে শিখতে হয়', এইসব — সব কিছু কেমন এলোমেলো, চৌপাট হয়ে যায় আজকের প্রাথমিক শিক্ষায়। ছাত্র তথা মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার প্রাথমিক মৌলিক সময়টা তার মনস্তত্ত্বে-ব্যক্তিত্বে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা, ধৈর্য্যহীনতা এবং বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করে দিচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা, বিশেষত পার্শ্বশিক্ষকেরা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ান, তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ছাত্রেরা পরবর্তী শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে বিন্দুমাত্র উপযুক্ত হয়ে উঠছে না, অন্তত সত্তর ভাগ ক্ষেত্রে। এদের কী হবে? এরা কি বেদনার সন্তান, স্যার?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ ও সহ-শিক্ষক নিয়োগের সামান্য বৃদ্ধি ঘটার ফলে এবং শিক্ষক সংখ্যার হারে শ্রেণীর বিভাগ বা 'সেকশন' সংখ্যা স্থির করা, ঘরের মাপে ছাত্রসংখ্যা স্থির করা, সেই অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করা ইত্যাদির ফলে আপাতভাবে মনে হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো মোটামুটি ভালোই চলছে, সমস্ত শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষক দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আসলে এতে স্কুলছুটের সংখ্যাই বাড়ছে। ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী বিদ্যালয় বাড়ানো হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ক্ষমতা অনুযায়ী একটা অংশ ছাত্রকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। পরের ধাপে প্রতিবছর পরীক্ষার পর বেশ কিছু ছাত্রকে টিসি দেওয়া হচ্ছে, কারণ তারা দুই বা তিন বছর অকৃতকার্য্য হয়ে একই শ্রেণীতে রয়েছে। আর এই টিসি দেওয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপ্ত করার এক সরকারি আয়োজন।

ফেল করানো চলবে না

দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক (!) শিক্ষার ঢ্যাঁড়া পিটিয়েও গাদা গাদা টাকা (মায়নাই) নিচ্ছে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলো। গাদা-গুচ্ছের বই প্রত্যেক শ্রেণীতে, কাগজ-খাতা, স্কুলড্রেস, প্রাইভেট মাস্টার — এতসব এই অগ্নিমূল্যের বাজারে চালাতে পারছে না সত্তর-বাহাত্তর শতাংশ বাবা-মা। সংসারেও অভাব বাড়ছে। তাই সন্তান একটু 'আদুটে' হয়ে উঠলেই বাবা-মায়ের হাত বাঁটায়। তার ওপর আবার যদি 'টিসি' পায়, তাহলে তো সংসারের জোয়ালে জুটে যাওয়ার ব্যবস্থা একেবারে পাকা। কোন একটা মুদিখানার দোকান, ছোটো কারখানা — কিছু একটাতে লেগে গেলেই মাসে পাঁচ-ছ'শ টাকা তো সংসারে আসছে। মিড-ডে মিল দিয়ে তাই স্কুলছুটের সংখ্যা ঠেকানো যাচ্ছে না। এ সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। সে আলোচনা স্বতন্ত্র। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কারণে বিদ্যালয় শিক্ষার মানকে যেভাবেই হোক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে হবে। তাই 'ফেল' করা ঠেকাতে হবে। যতটা পারা যায়, 'অকৃতকার্য্য' হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়া কমাতে হবে, কমাতেই হবে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানা প্রশ্ন যে উঠতে শুরু করেছে!

শিক্ষার মান

এদিকে, শিক্ষক সংগঠনকে চটালে চলবে না। তাঁরাই যে 'ভোট মেশিনারি'! সুতরাং তাঁরাও পড়াবেন না ক্লাসে। যখন যেমন ইচ্ছা স্কুলে আসবেন। প্রধান শিক্ষকের ঘাড়েই বা ক'টা মাথা যে, তিনি 'আইনের শাসন' রক্ষা করবেন। তাছাড়া, এখন প্রধান শিক্ষক হওয়ার অন্যতম শর্তই তো শাসক দলের 'গুডবুক'-এ থাকা। ফলে সোনায় সোহাগা। তবে এসবের বাইরে বেশ কিছু ভালো শিক্ষক অবশ্যই আছেন। তাঁরা পড়াতে চান ছাত্রদের। ভালোবাসেন

ওইসব কচিকাঁচাগুলোকে। কিন্তু এক-একটা শ্রেণীকক্ষে ১২০ থেকে ১৪০ জন ছাত্র, অন্তত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি, সর্বোপরি পড়ানোর নেশা দিয়ে যতটা পারেন চেষ্টা করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই এরকম কিছু মাস্টারমশাই থাকেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টায় সামগ্রিক মানের খুব একটা হেরফের হয় না।

তাই শিক্ষা দপ্তরের কর্তা-মন্ত্রী-আমলাদের কিছু একটা বিধি-ব্যবস্থা করতেই হয় শিক্ষার মানকে অন্তত আর পাঁচটা রাজ্যের থেকে ভালো করে দেখাতে। সুতরাং শিক্ষার আধুনিকীকরণের নামে আসে দ্বিমুখী কৌশল — এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত 'ইউনিট টেস্ট' এবং'গ্রেডেশন' পদ্ধতি। প্রথম বছরে আটটি এবং পরের বছরে পাঁচটি ইউনিট টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য হিসেবে দেখানো হয়, এতে ছাত্রদের মানসিক চাপ কমবে, গুটি গুটি পায়ে পাঠক্রম আত্মস্থ করবে তারা। 'স্মৃতি-ক্ষমতা-চক্র'-এর সামর্থ্য-বিজ্ঞান অনুযায়ী পাঠক্রমকে ভেঙে ভেঙে 'জানা'-কে 'জ্ঞান'-এর দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। বছরের শেষে সামগ্রিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই হবে 'বার্ষিক মূল্যায়ন'-এর পরীক্ষা। ইউনিট টেস্ট এবং বার্ষিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে তার গড় অনুযায়ী গ্রেড স্থির হবে প্রতিটি বিষয়ে। এই গ্রেডেশন প্রথায় শ্রেণীতে কে প্রথম, কে দ্বিতীয় কিছুই বোঝা যাবে না। ফলে ছাত্রদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে কমে যাবে। তত্ত্বগতভাবে এইসব কথাগুলো শুনতে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু ওই ইউনিট টেস্টের ধারণা যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে, সেখানে একটি শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক মাত্র ১৬ থেকে ২০ জনকে পড়ান। ইউনিট টেস্টের সময় বেঞ্চির দু'প্রান্তে দুজন করে ছাত্র বসে পরীক্ষা দেয়, শিক্ষক মহাশয়ের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে। ফলে শিশু-কিশোরদের সরল-সহজাত-নিষ্পাপ বন্ধুত্বও কাউকে কোন (অন্যায়) সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে না, উত্তর লেখার ক্ষেত্রে। আর, এ রাজ্যের স্কুলে ছ'জন বসার বেঞ্চিতে সাতজন বসে পরীক্ষা দেয়, তাতে যা হওয়ার তাই হয়। আখের গুছিয়ে নেওয়ার চালু পথ দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছাত্রদের, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ধ্বংসাবশেষ ঢাকতে। তাতেও যদি কেউ না পারে, তবে আছে 'সংশোধনী' পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় অঘোষিত এক রীতি আছে – পাশ করিয়ে দিতে হবে সবাইকে। এইভাবে ইউনিট টেস্টের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাশ মার্কসের চেয়ে কিছুটা বেশি বোনাস মার্কস তুলে রাখার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। কারণ বার্ষিক পরীক্ষায় একসঙ্গে অনেক নম্বরের প্রশ্ন লিখতে হয়, পুরো সিলেবাসের ওপর পরীক্ষা হয়। সেখানে যদি পাশ মার্কসের চেয়ে নম্বর কম ওঠে, তখন ওই ইউনিট টেস্টের বোনাস মার্কস বাঁচাবে। গড়ে পাশ নম্বর হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, অনেক ছাত্রছাত্রী ইংরেজি ও অঙ্কে অকৃতকার্য্য হচ্ছে। তাদের জন্যেও গ্রেডেশনে ঢাল-এর ব্যবস্থা আছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'গ্রেড ডি' পেলে আর বাকি বিষয়গুলোতে এ, বি, সি ইত্যাদি পেলে, সে কৃতকার্য্য। ডি গ্রেড হচ্ছে শূন্য থেকে চব্বিশ নম্বর পর্যন্ত। তাহলে কী দাঁড়াল? ইংরেজি ও অঙ্কে দুই, চার, ছয় পেয়েও যে কোন ছাত্রছাত্রী অনায়াসে পরের শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছে। অতএব পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ওঠার ব্যবস্থা একদম পাকা। দেখি কী করে শিক্ষার ত্রুটির জন্য স্কুলছুট হয়! কী করেই বা শিক্ষার মান নিচে নামে!

আসলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, আধুনিকীকরণ — এইসব গালভরা বুলির আড়ালে রাজ্যের ভেঙে পড়া শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাস্থ্যবান করে দেখানোর রাজনৈতিক স্বার্থে আগামী প্রজন্মগুলোকে নৃশংসভাবে মৃত্যুগহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে শিক্ষাকর্তারা। উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে যেভাবে রাজ্যস্তরে শক্তিশালী বিতর্ক চলছে, শিক্ষার মান এবং অভিমুখ নিয়ে তার চেয়েও গভীরে চর্চা এই মুহূর্তে শুরু হওয়া দরকার।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

(৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৪ — ১৫ জুন ২০০৯)

১৫ জুন দুপুর তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ টেলিফোন এল অমলেন্দু নেই। ওপাশে অমিয়র গলা, আমাদের বন্ধু অমিয় দেব। মুখ দিয়ে কথাটা অজান্তেই বেরিয়ে এল, মানে? অমলেন্দু এই কিছুক্ষণ আগে মারা গেল। মৃত্যুর খবর এমনও হয়। এমন নয় যে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন তিনি। আমাদের মতো বয়সে সবারই যেমন হয়, এটা সেটা সমস্যা কিছু কিছু ছিল, তা জানতামও আমরা। কিন্তু চলে যাবার মতো তেমন কিছু জানা ছিল না। কিন্তু তবুও অমলেন্দু চক্রবর্তী মারা গেলেন এই ১৫ জুন দুপুরবেলায়, নিজের বাগুইআটির বাড়িতেই। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তখনও সেই বিছানাতেই শোওয়া। ঠিক যেন ঘুমন্ত। শুধু গায়ের ওপর কিছু ফুলের মালা চাপানো।

দু-একজন বললেন বটে যে, কাল পরশুও গল্প করে আড্ডা দিয়ে গেছেন যাঁরা তাঁরা শুধু একটু খেয়াল করেছিলেন, শরীরটা কেমন লাগছে যেন ওঁর। তার বেশি কিছু না। উনি নিজেও তা নিয়ে বলেননি কিছু। বলবেন না এটা স্বাভাবিক। যাক, এসব নিয়ে এখন আক্ষেপ করা বৃথা। সবই মেনে নিতে হয়।

আমাদের জন্য রয়ে গেল ওঁর রচনাবলী আর একটা বেশ একটু আলাদা রকমের জীবনযাপন। সবাই জানেন অমলেন্দু চক্রবর্তী লিখতেন গল্প আর উপন্যাস। আমাদের সময়ের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস লেখকের সঙ্গে অমলেন্দুবাবুর (হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসে আমাদের ডাকাডাকি ওই রকমই) একটা বড়ো তফাত লক্ষ করা দরকার। ওঁর গল্প উপন্যাসের সংখ্যা এখনকার অনেকের তুলনায় একটু উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সে কথাটা খেয়ালও করা হয়েছে। আমাদের একজন প্রধান সমালোচক এই সেদিনও ওঁর স্মরণসভায় বললেন, অমলেন্দু তাঁর সমসাময়িক অনেক লেখকের থেকেই লিখেছেন কম। তবে এই সঙ্গে তিনি একথাও জানাতে ভোলেন না যে 'রাধিকাসুন্দরী' বাংলা উপন্যাসের একটা ধারার সম্ভবত শেষ গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন যে ওই উপন্যাস রচনা করার সময় কতটা সময় তিনি নিজেকে অনন্যমনা রাখার চেষ্টা করেছিলেন। 'গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন', 'যাবজ্জীবন' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তিনি বোধহয় নিজেকে 'রাধিকাসুন্দরী'র জন্য প্রস্তুত করেও নিচ্ছিলেন।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর প্রস্তুতি জীবনযাপনের স্তরেও লক্ষণীয় ছিল। তিনি নিজেকে বেশ যত্নে চারপাশের জীবনধারার সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। দোকান বাজার পথঘাট, এ সবই ছিল তাঁর নিজস্ব চলাফেরার জগৎ। এক সময়ে গুড়াপের স্কুলে পড়িয়েছিলেন। সেটা তাঁর শুধু জীবিকা ছিল না। গুড়াপ তাঁর অস্তিত্বে কীভাবে জায়গা করে নিয়েছিল সে তাঁর সঙ্গে একটু মেলামেশা করলেই টের পাওয়া যেত। সেই গুড়াপ থেকে খিদিরপুর আর হাতিবাগান সবই তিনি একটানে ধরতে জানতেন। শেষের

Manthan Samayiki **Regn. No. WBBEN/2000/3047**

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।

ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net, দূরভাষ : 2491-3666

কয়েক বছর বাগুইআটির বসবাসও তাঁর জীবনে বৃথা যায়নি। তিনি সেখানেও দিব্বি শেকড়বাকড় ছড়িয়েছিলেন। একটু বয়স হয়ে গেলেই অনেকের পক্ষে সেটা আর সম্ভব হয় না। সম্ভবত অল্প বয়সের রাজনীতি দীক্ষা থেকে এটাই তাঁর স্থায়ী প্রাপ্তি। কত রকমের কাজের সঙ্গে তিনি নিজেকে শামিল করতে পারতেন। এসব ব্যাপারে বয়সের দূরত্ব বা অন্য কোনও দূরত্ব তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াত না। ছোটোখাটো পত্রপত্রিকার জগতে তিনি মিশে যেতে পারতেন সহজে। তাদের নানা ধরনের কাজকর্মেও আগ্রহে তিনি শরিক হয়ে যেতে পারতেন। কোনও কোনও পত্রিকাকে তিনি নিজের কাজ হিসেবেই সাহায্য করতেন। মন্থন সাময়িকীর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। অমলেন্দু চক্রবর্তীর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোক জ্ঞাপন করছি। পত্রিকার তরফে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।